RNI No. WBBIL / 2007 / 25121

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির মুখপত্র

শিক্ষা ও শিক্ষক

PASCHIMBANGA SIKSHAK SAMITIR MUKHOPATRA SIKSHA-O-SIKSHAK

(Volume-21) (Issue-4)

Bimonthly & Bilingual Journal (দ্বিমাসিক ও দ্বিভাষিক পত্রিকা)

Language : Bengali & English

ভাদ্র-আশ্বিন—১৪৩১ জুলাই-আগস্ট—২০২৪

Bhadra-Ashwin–1431 July-August-2024

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বিদ্যালয়ের এবং মাদ্রাসার শিক্ষক, শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মী বন্ধুগণের প্রতি আবেদন, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতি (W.B.T.A)-র সদস্যপদ গ্রহণ করুন, পত্রিকার গ্রাহক হন। সমিতির মুখপত্রে নিজের বলিষ্ঠ মত প্রকাশ করুন। শিক্ষার স্বার্থে শিক্ষক আন্দোলনকে জোরদার করুন।

নমস্কার সহ

গোলাম মোস্তাফা সরকার	প্রসেনজিৎ দে	অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়	সেখ আব্দুল মালেক	চঞ্চল কুমার ঘোষ
সভাপতি	*কার্যকরী সভাপতি*	*কোষাধ্যক্ষ*	*সহ-সাধারণ সম্পাদক*	*সাধারণ সম্পাদক*
9475319741	8145228145	9434617788	9733908032	9434553133

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতি

West Bengal Teachers' Association

সমিতি কার্যালয় ঃ ৮বি/২, টেমার লেন কলকাতা-৭০০ ০০৯ ফোন ঃ ২২৪১-৩৫৩৭

Office : 8B/2, Tamer Lane, Kolkata-700 009, Telephone : 2241-3537

Joint Editor : Krishnendu Jana and Anuhlad Biswas

যুগ্ম সম্পাদক : কৃষ্ণেন্দু জানা এবং অনুহ্লাদ বিশ্বাস

E. Mail : wbta1949 @gmail.com. Website : www.wbta.in

গণতন্ত্র-প্রিয় জাতীয়তাবাদী শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীদের আন্দোলনের একমাত্র হাতিয়ার—

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতি— W. B. T. A

শিক্ষারস্বার্থে, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মী সমাজের কল্যাণে এই সমিতির ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমিতিকে শক্তিশালী ও মজবুত করুন।

সদস্য চাঁদা ঃ বার্ষিক ৪০ (চল্লিশ) টাকা মাত্র

সমিতির মুখপত্র "শিক্ষা ও শিক্ষক" এর গ্রাহক চাঁদা

বার্ষিক ৬০.০০ (ষাট টাকা) **সডাক ৭০.০০ (সত্তর টাকা)**

গোলাম মোস্তাফা সরকার	প্রসেনজিৎ দে	অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়	সেখ আব্দুল মালেক	চঞ্চল কুমার ঘোষ
সভাপতি	*কার্যকরী সভাপতি*	*কোষাধ্যক্ষ*	*সহ-সাধারণ সম্পাদক*	*সাধারণ সম্পাদক*
9475319741	8145228145	9434617788	9733908032	9434553133

Advertisement Tariff

ANNUAL

2nd Cover :	10,000/-
3rd Cover :	9,000/-
Ordinary Full Page :	6,000/-
Ordinary Half Page :	4,000/-

CASUAL (Monthly)

Full Page :	1,500/-
Half Page :	1,000/-

Technical Data

Overall Size :	18 × 23 cm
Print Area :	15 × 21 cm.

সূচিপত্র

১. সম্পাদকীয় — শিক্ষার সামাজিকীকরণ 6

২. সমিতির সমাচার 7

৩. শোক প্রস্তাব 9

৪. Government of West Bengal Memo No : 239-SED-13037/18/2024-ELEMN Dept. of SE Dated : 15.07.2024 10

৫. Government of West Bengal Memo No : 696-SC/Apt SED-18027/1/2024-Js(SED)-Dept of SE Dated Kolkata the : 18.07.2024 11

৬. Government of West Bengal Memo No : CSE/043/2024//PBSSM-11034/1/2023-DSPD (PBSSM) Date : 27.07.2024 12

৭. Government of West Bengal Memo No : 207-ES(CMDMP)/Cooked Food-01/2022 Dated : 09.05.2024 13

৬. মনীষীদের চিন্তায় শিক্ষা—ঝন্টু প্রসাদ মণ্ডল (উপদেষ্টা পঃ বঃ শিঃ সমিতি) 14

৭. গহরজান : একটি জীবন ও অফুরন্ত বিস্ময়—দেবজ্যোতি রায় 17

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সঙ্গীতময় সৃষ্টিকর্মের অভিভাবক ও জীবননির্মাণ— ড. সুজিতকুমার বিশ্বাস (ডিস্টিক পেডাগগি কোঅর্ডিনেটর, সমগ্র শিক্ষা মিশন নদীয়া) 21

৯. ধ্বংসের পঙ্গপাল বাসা বেঁধেছে—অসিম কুমার মাইতি 25

১০. ঝিনুক কুড়ানো—অসিম কুমার মাইতি 25

১১. লোকসাহিত্য শিশু এবং মেয়েলি ব্রতকথা— তুষার কান্তি ষন্নিগ্রহী (উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য, পঃ বঃ শিঃ সমিতি) 26

১২. স্বাধীনতা আন্দোলনে মুর্শিদাবাদ—প্রদীপ নারায়ন রায় 26

১৩. একশত পঁচিশ বর্ষ পূর্তির প্রাক্কালে কথাকার তারাশঙ্করের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি —শ্রী জয়ন্ত প্রকাশ ভৌমিক 28

১৪. প্রশ্নোত্তর—পরেশ চন্দ্র শেঠ 31

সম্পাদকীয়

শিক্ষার সামাজিকীকরণ

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের জীবনে শিক্ষা কথাটি জড়িয়ে আছে। মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিকাশ ও অগ্রগতির জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। মানুষের সুন্দর ও সুস্থভাবে জীবনযাপন, সামাজিক উন্নয়ন এবং সভ্যতার অগ্রগতির জন্য উপযুক্ত শিক্ষাই একমাত্র হাতিয়ার! শিক্ষা অতীতের সংস্কৃতিকে বহন করে, বর্তমান সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং ভবিষৎ এর প্রগতিকে ত্বরান্বিত করে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—"Education is the menifestation of perfection already in man".

রুশোর মতে—"Education is the unfoldment of the child. It is the skill of human behavier pattern".

আবার সক্রেটিস বলেছেন—"Education is self realisation."

সংকীর্ণ অর্থে বিদ্যালয়ে অর্জিত জ্ঞান ও কৌশলকে আমরা শিক্ষা বলে থাকি। কিন্তু কোনো মনোবিদ বা বিজ্ঞানী বিদ্যালয়ের অর্জিত জ্ঞানকে প্রকৃত অর্থে সম্পূর্ণভাবে শিক্ষা বলতে চান নি।

মানুষের জীবনপ্রবাহ, সমাজ ও দেশের অগ্রগতি উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব। আধুনিক ভারতীয় শিক্ষা বিষয়ে বলা হয়েছে—শিক্ষার উদ্দেশ্য "ব্যক্তিগত চাহিদার সাথে সামাজিক চাহিদার সামঞ্জস্য বিধান করা, সামাজিক ও জাতীয় সংহতি বিকাশে সাহায্য করা। এছাড়া ব্যক্তির সামাজিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক গুণগুলি বিকাশে সহায়তা করা।"

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন—'Educational Institution is where young and old, the teacher and the student set at the same table to partake of their daily food and the food of their eternal life."

আমাদের একটা কথা মনে রাখা দরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র শিক্ষাদানের কেন্দ্র নয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়কেই বিভিন্ন ধরনের সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়।

বিভিন্ন সামাজিক দায়িত্ব পালনের সাথে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মসূচি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এরই অঙ্গ হিসেবে ২০২৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ থ্যালাসেমিয়া রোগ নির্ণয়র জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ওয়েস্টবেঙ্গল হিউম্যান ওয়েল ফেয়ার অ্যান্ড নেচার অর্গানাইজেশন, স্বাস্থ্যবিভাগ এবং পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতি এই রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করছে। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির নির্বাচিত স্কুল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের রক্ত সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হচ্ছে তারা থ্যালাসেমিয়ার রোগী কিম্বা বাহক কিনা। আগামী বংশধরদের মধ্যে যাতে এই রোগ না ছড়ায় সেজন্য প্রচারও করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির প্রতিষ্ঠার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এই রক্ত পরীক্ষার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

উপযুক্ত শিক্ষার জন্য চাই সুস্থ শিশু, সুস্থ সমাজ। তারই প্রচেষ্টা সকলকে একসাথে নিতে হবে। এটাও শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

সমিতির সমাচার

আজ 24.03.24 রবিবার হায়াত ভবনে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির মালদা শাখার পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটি গঠন করা হল :

সভাপতি : গৌতম ঘোষ

সহ-সভাপতি : মনসূর আলি

নিশীথ সরকার

সাধারণ সম্পাদক : অভয় কুমার মণ্ডল

সম্পাদক : রাজিকুল ইসলাম

কনক সরকার

কোষাধ্যক্ষ : মকলে সুর রহমান

সদস্য : বঙ্কিম বিশ্বাস, মার্জবর রহমান, ধৃতিমান বাগচী, নইম আলি, ভবানী সরকার, দিব্যেন্দু কুমার দাস, রুহুল আমিন, মনোজ সরকার, বিধায়ক মণ্ডল, দিব্যেন্দু সেন মণ্ডল।

হাওড়া জেলার সম্মেলনের রিপোর্ট

১৮.০৮.২০২৪ তারিখ রবিবার হাওড়া জেলার ৩২তম দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন এবং ৭৫ বছর পুর্তি উদ্‌যাপন হোল মাকড়দহ বামাসুন্দরী ইন্সটিটিউশনে শ্রী অন্নদাশংকর দত্ত সভাঘরে। জাতীয় পতাকা এবং সমিতির পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শশাঙ্কশেখর বেরা। সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন হাওড়া জেলা শাখার সভাপতি পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। শহিদ বেদীতে মাল্যদান করেন রাজ্য সভাপতি গোলাম মুস্তাফা সরকার, সাধারণ সম্পাদক চঞ্চল কুমার ঘোষ ও উপদেষ্ঠা মণ্ডলীর সদস্য ঝন্টুপ্রসাদ মণ্ডল মহাশয়।

বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা অন্নদা প্রসাদ দত্ত এর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও উপদেষ্ঠা মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য শিশির সরকার মহাশয়। অতঃপর বিশিষ্ট অতিথীদের মঞ্চে ডেকে নেওয়া হয় এবং পুষ্পস্তবক, উত্তোরিয় ও ব্যাজ পরিয়ে বরণ করা হয় যথাক্রমে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শশাঙ্ক শেখর বেরা, জেলার সভাপতি পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্য সভাপতি গোলাম মুস্তাফা সরকার, সাধারণ সম্পাদক চঞ্চল কুমার ঘোষ, উপদেষ্ঠা মণ্ডলীর সদস্য শিশির সরকার, ঝন্টুপ্রসাদ মণ্ডল, জয়ন্ত প্রকাশ ভৌমিক, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক তপন কুমার রায়, পত্রিকা সম্পাদক অনুহ্লাদ বিশ্বাস ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ভবানীপ্রসাদ রায়, উপদেষ্ঠা মণ্ডলীর সদস্য বিবেকানন্দ

মুখোপাধ্যায়, কার্যকরী সভাপতি প্রসেনজিৎ দে, রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য আশীষ কুমার মাঝি, প্রাক্তন সাংগঠনিক সম্পাদক অখিল চন্দ্র সরকার, প্রাক্তন Editorial Board-এর সদস্য অসীম কুমার মাইতি।

সভা শুরুর প্রাক্কালে স্বাগত ভাষণ দেন হাওড়া জেলার সভাপতি পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। সভা শুরুতে উদ্‌বোধনী সমবেত সংগীত পরিবেশন করেন এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষিকাবৃন্দ, যথা মনীষা পাল, নিবেদিতা সিনহা সরকার, সৈকত চক্রবর্তী ও তুষার পাল। উদ্বোধনী ভাষণ দেন এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শশাঙ্ক শেখর বেরা মহাশয়। তিনি তার ভাষণে বর্তমান ও অতীতের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষা আন্দোলনের কথা উল্লেখ করেন। এই বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভবানী প্রসাদ রায় তার বক্তব্যের মাধ্যমে শিক্ষার সমস্যার কথা উল্লেখ করেন।

উল্লেখ থাকে যে জেলার সাধারণ সম্পাদক রাজকুমার চন্দ্রের তত্বাবধানে সমস্ত অতিথী ও প্রতিনিধিদের রাখী পরানো হয়। এবং জেলার সাধারণ সম্পাদক রাজকুমার চন্দ্র তার প্রতিবেদন পাঠ করেন। তারপর রাজ্য সভাপতি গোলাম মোস্তাফা সরকার বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে এবং তার সমাধানে শিক্ষকদের ভূমিকা আলোচনা করেন। সাধারণ সম্পাদক চঞ্চল কুমার ঘোষ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, আজ জেলা সম্মেলনের সঙ্গো ৭৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানও পালিত হয়। সেক্ষেত্রে তিনি বলেন, স্বাধীনতার পূর্বে আমাদের এই সংগঠন তার বিস্তারিত ইতিহাস আমাদের উপদেষ্ঠা মণ্ডলীর সদস্যগণ যেমন—শিশির সরকার, ঝন্টুপ্রসাদ মণ্ডল ও জয়ন্ত প্রকাশ ভৌমিক মহাশয়গণ বিস্তারিত আলোচনা করবেন। আমি সংগঠনের গুটি কয়েক কথা নিবেদন করতে চাই, যেমন—নতুন সিলেবাসে 1st semister WBTA এর প্রকাশিত Pre-test Paper ও VII & VIII এর সংস্কৃত বই ও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক প্রকাশিত হয় এগুলো বিদ্যালয়ে ছাত্রদের উপযোগী করে তুলতে হবে এবং আমাদের মুখপাত্র ''শিক্ষা ও শিক্ষক" এর সংখ্যা বাড়াতে হবে। উপদেষ্ঠা মণ্ডলীর সদস্য ঝন্টুপ্রসাদ মণ্ডল মহাশয় সমিতির ইতিহাস পর্যালোচনা করেন, তার বিভিন্ন সংগৃহীত তথ্যের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন। উপদেষ্ঠা মণ্ডলীর সদস্য শিশির কুমার সরকার মহাশয় তার বক্তব্যের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্যভাবে তিন জন সমিতির শুরুতে যাদের অবদান ছিল যেমন—বামন দাস মণ্ডল, অমিয় সেন ও হরিদাস গোস্বামী এদের তথ্য সম্বলিত লেখা থেকে সমিতির ইতিহাস ব্যাখ্যা করেন। তার উপদেষ্ঠা মণ্ডলীর সদস্য জয়ন্ত প্রকাশ ভৌমিক সমিতির ইতিহাস বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করেন, কার্যকরী সভাপতি প্রসেনজিৎ দে শিক্ষা ব্যবস্থার সক্রিয়ভাবে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন, সমিতির অন্যতম সম্পাদক আশীষ মাঝি বর্তমান পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির তীব্র আন্দোলনের কথা উল্লেখ করেন। সর্বশেষে জেলার আগামী Executive সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হয়। ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা হয়।

শোক প্রস্তাব

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মহাপ্রয়াণে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতি গভীরভাবে মর্মাহত। তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি এবং পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতি

হাওড়া জেলার ঝাড়হাট ফকির চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয় (উ: মা:) এর প্রাক্তন সহকারী শিক্ষক ও পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির (হাওড়া জেলা শাখা) প্রাক্তন সহ-সভাপতি শ্রী অনিল কুমার বটব্যাল ৮৪ বছর বয়সে ২০২৪ সালের ৫ই জুলাই ইহলোক ত্যাগ করেন, তাঁর আত্মার চিরশান্তি কমনা করি ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানাই।

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতি

Government of West Bengal
Department of School Education
Elementary Education Branch
Bikash Bhavan, 5th Floor, Salt Lake, Kolkata-700 091

Memo No : 239-SED-13037/18/2024-ELEMN SEC Dept. of SE Dated : 15.07.2024

From : Additional Secretary
to the Govt. of West Bengal

To :
(1) Commissioner of School Education, West Bengal
(2) Secretary, West Bengal Board of Primary Education
(3) District Inspectors of School (Primary Education) (All)
(4) Chairperson, DPSC/PSC/DSB (All)

Sub : Child Care Leave in respect of Adopted Child.

The undersigned is directed to send herewith a copy of Memo No. 2452-F (P), dt. 21/04/2017 on the subject mentioned above and to request them to take necessary action from their end.

Enclo : As stated

15/07/24

Additional Secretary
to the Govt. of West Bengal

Government of West Bengal
School Education Directorate
(Appointment Branch)
Bikash Bhavan, 7th Floor, Salt Lake, Kolkata-91

Memo No : 696-SC/Apt **Dated Kolkata the : 18.07.2024**
SED-18027/1/2024-Js(SED)-Dept of SE

To,
The District Inspectors of Schools (SE),
All Districts.

Sub : Pay fixation in respect of ICT instructors following memo no. 1086-F (P2) dated 01.03.2014

You must be aware that remuneration of Contractually engaged IT Personnel (CITP) who have been brought under the ambit of Memo no. 192-IT dated 16.10.2020 have been enchanced Vide Memo no. 1086-F(2) dated 01.03.2024

You are therefore, requested to send a draft pay fixation order in respect of all ICT Personnel, who have been engaged in phases I – V of ICT @School project and come under 192-IT dated 16.10.2020, after due scrutiny and verification of all the documents of initial engagement / break in service etc, to this end of taking necessary action for ratification by P & AR Department, mandated vide memo no. 1086 F(P2) dated 01.03.2024 within 19.07.2024.

A pay fixation template is sent herewith to your end as a ready reckoner. Please check the engagement letter of the concerned person as provided with the link in Column (I) and enter the date of initial engagement accordingly in column (J). Also please update column (L).

The job needs to be completed by 19.07.2024.

18/7/24

Commissioner of School Education
West Bengal

Government of West Bengal
Department of School Education
Elementary Education Branch
Bikash Bhavan, 7th Floor, Salt Lake, Kolkata-700 091

Memo No : CSE/043/2024//PBSSM-11034/1/2023-DSPD(PBSSM) Date : 27.07.2024

From : Commissioner of School Education, West Bengal.

To :

1. The President,
   West Bengal Board of Primary Education,

2. The President,
   West Bengal Board of Secondary Education

Sub : Introduction of Holistic Progress Report Card from the academic year 2025

Ref : Memo No. 249-TBC/2A/46P/2023 dated 11.06.2024

Sir,

In continuation to the memo under reference, this is to inform you that the new Holistic Progress Report Card (HPC), developed for the students from Classes–I to VIII, has been decided to be implemented from the academic year 2025.

You are requested to take necessary action accordingly.

This has the approval of the competent authority.

Yours faithfully,

Commissioner of School Education,
West Bengal

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
School Education Department
Office of the Project Director
Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM POSHAN)
Acharya Prafulla Chandra Bhavan, Plot 7/1, Block-DK, Salt Lake
Sector–II, Karunamoyee, Kolkata-700091
Phone Nos. : 033-23596761, 033-23344052 (Fax),
Email : director.cmdmp@gmail.com

Memo No : 207-ES(CMDMP)/Cooked Food-01/2022 **Dated : 09.05.2024**

From : The Principal Secretary to the Govt. of West Bengal
School Education Department.

To : The Principal Secretary to the Govt. of West Bengal
Department of Public Health & Engineering

Sub : Testing of Drinking Water in Schools

Sir,

Apropos the above, PM POSHAN (erstwhile CMDMP) guidelines have mandated the essential testing of cooked Mid Day Meal in the schools against the standards of food safety. It has been decided that water quality as well as meal testing will be done in 5% schools in a time frame of three months. West Bengal has a total of 82,000 schools under PM POSHAN and therefore, the target to testquality water quality is approx. 4100 schools by August.

In view of the above, I would request you to kindly issue necessary instruction to the concerned official under your Department to do needful at the earlist.

PD, PM POSHAN will coordinate with competent authority for further progress.

Your early response is highly solicited so that the process may begin immediately after schools reopen post summer vacation.

Yours faithfully,

Principal Secretary
School Education Department

মনীষীদের চিন্তায় শিক্ষা

ঝণ্টুপ্রসাদ মণ্ডল (উপদেষ্টা, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতি)

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পঁচাত্তর (৭৫) বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে ৭৫তম বর্ষ পালন করা দেশবাসীকে একটা সর্বাঙ্গীণ শূন্যতা আর হতাশার মধ্যে নিমজ্জিত হতে হয়। সর্বত্র শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানসহ সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক ও মৌলিক চাহিদাসমূহ স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রের পূরণ করার দায়িত্ব ছিল, তা পুরিত হওয়া দূরের কথা ন্যূনতম সমস্যাবলীর সামান্যতম সমাধানে সরকারের তরফে কোন প্রকার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়নি।

শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতি (W.B.T.A.) সংগঠন ৭৫ বছরে পদার্পণ করেছে অন্য সব বাদ দিলেও শিক্ষা ভাবনায় আমরা লক্ষ্য করছি বার বার শিক্ষার উপর উভয় সরকারের পক্ষ থেকে আক্রমণ নেমে এসেছে। স্বাধীনোত্তর ভারতে শিক্ষা আক্রান্ত হয়েছে বার বার। ক্ষমতাসীন শাসক গোষ্ঠী বুলি আওড়িয়েছেন শিক্ষা মানুষের "মৌলিক অধিকার" আর পদদলিত করেছে রামমোহন—বিদ্যাসাগর—রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ নবজাগরণের সকল মনীষীদের শিক্ষার সার্বজনীন বিস্তারের সুখ স্বপ্ন সমূহকে। শিক্ষা ক্রমাগত সংকুচিত হয়েছে। শিক্ষায় বাণিজ্যিকীকরণ-বেসরকারীকরণের দ্বার অবাধে উন্মোচিত হয়েছে। যে সকল মনীষীরা এদেশে ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, নীতি-নৈতিক মূল্যবোধ ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রবর্তনের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন—তা অধরাই থেকে গেছে।

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ধর্মনিরপেক্ষ, সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, ধ্যান-ধারণা, রাষ্ট্র পরিচালনা সবই প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির অনুসরণে পরিচালিত। বেদ, উপনিষদ, গীতা, পুরাণ, ভাগবৎ, রামায়ণ, মহাভারত, কোরান, বাইবেল, ত্রিপিটক, গীতা-চণ্ডী প্রভৃতি ধর্মীয় গ্রন্থ ও মহাকাব্যের অনুশাসনে এবং আমাদের অধ্যাত্মবোধ, নৈতিকতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা অর্জনে ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সদা-সর্বদা অতন্দ্রপ্রহরীর মত পাহারা দিয়ে চলেছে। প্রাচীনকালে গুরুগৃহে শিক্ষাচর্চা, আশ্রমিক জীবনযাত্রার মাধ্যমে সৎ-চিন্তা-ভাবনা অনুসরণে সাহায্য করে চলেছে। টোল, চতুষ্পাটি ও মক্তব্যের মাধ্যমে শিক্ষাদান প্রভূত অর্থবহ, সাফল্যজনক ও ফলপ্রসূ হয়েছিল।

বহুদিন যাবৎ আর্য-অনার্য, শক-হূণ, পাঠান, মোগল, ওলন্দাজ, পার্সি ও ইংরেজ প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর শাসন ও শোষণে ভারতবাসী নিজেদের স্বাজাত্যবোধ হারিয়ে পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। বহু বরেণ্য ব্যক্তিত্বদের যথা গান্ধীজি, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, ক্ষুদিরাম, মাতঙ্গিনী, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, নিবেদিতা প্রমুখ জাতীয়তাবাদীদের জাতীয় ঐক্য ও স্বাজাত্যবোধ জাগ্রত করার দৃঢ় পণ ও মরণপণ সংগ্রামে বিদেশী শক্তিকে পর্যুদস্ত করে ভারতবাসী স্বাধীনতা অর্জন করে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট।

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে শিক্ষাক্ষেত্রে মৌলিক চিন্তা-ভাবনার উৎকর্ষতা বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রাথমিক স্তর থেকে নিজ নিজ মাতৃভাষার মাধ্যমে সঠিক ও নির্ভুলভাবে সাক্ষর হওয়াকে সর্বপ্রথম ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন বলে মেনে নেওয়া হল। সংস্কৃত ভাষা মাধ্যমিক স্তরে আবশ্যিক (compulsory) করা হোল। পাঠক্রম-পাঠ্যসূচীতে রদ-বদল, ইংরাজী শিক্ষার গুরুত্ব হ্রাস, পাশ-ফেল প্রথার অবলুপ্তি শিক্ষাকে ব্যবসায়িক পণ্যে পরিণত করা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে অবহেলা ও কম্পিউটার শিক্ষার বিরোধিতা করে শিক্ষামিশন প্রকল্পের অবমূল্যায়ন, হার্মাদ বাহিনীর রক্তচক্ষু দাপটে চরম বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টির ফলে মেধার অবমূল্যায়ণ সৃষ্টি হয়েছে।

আধুনিক ভারতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে—"Education should be developed so as to increase productivity, achieve Social and National integration, accelerate the process of modernization and cultivate, social, moral and spiritual values." শিক্ষা পরিচালিত হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। দেশ ও সমাজের উন্নয়নে শিক্ষকদের অবদান সর্বাগ্রে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হল মিলন ক্ষেত্র। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিষয়ে বলেছেন—It is where young and old the teacher and the students it at the same table to partake of their daily food and the food of their eternal life." শিক্ষক প্রকৃতপক্ষে "Friend, Philosopher and guide". জ্ঞানার্জনের জন্য পড়তে, লিখতে ও শিখতে একান্তভাবে দরকার। পড়া, বলা ও লেখা একসংগে দরকার। বেকন বলেছেন—Reading makes a full man, conversation a ready man, writing an exact man". বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায় বলা যায়—"জ্ঞানের দীনতা তাই আপনার মনে পূরণ করিয়া লহ যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে। শিক্ষার আর একটি অঙ্গ লিখন—পড়ার পর যদি বিষয়টি লেখা যায় তা হলে স্মৃতিপটে দীর্ঘক্ষণ আঁকা থাকে। আমাদের শিক্ষা হবে এমন যার মাধ্যমে সারা বিশ্বে আসবে শান্তি, প্রগতি এবং ঐক্য হবে সুদৃঢ়। দেশে দেশে চরিত্রবান সুনাগরিক গড়ে উঠবে। মানুষে মানুষে থাকবে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। মনুষ্যত্ব হবে অতলস্পর্শী। স্বামী বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীরা শিক্ষাকে বাস্তবতার আলোকে নিয়ে এসেছেন। তারা বলেছেন ব্যক্তি সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ, ভেদাভেদের অবসান। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন—"বুনিয়াদী শিক্ষা"। জাকির হোসেন বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠক্রম তৈরী করে বলেছেন শিক্ষা হবে কর্মভিত্তিক। আর তার কেন্দ্রে থাকবে শিল্প। শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষা। শিক্ষার মূলকথা হল—শিশুর ব্যক্তি সত্তার বিকাশ। "ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ"। নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে একাগ্রচিত্তে সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে জ্ঞানার্জনের তপস্যায় ব্রতী হওয়া সকল শিক্ষার্থীদের অবশ্য কর্তব্য। স্বামীজী শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেছেন—"Education is the manifestation of the perfection already in man"—প্রকৃত শিক্ষা হইতেছে তাহাই যাহা মানব প্রকৃতির অজ্ঞান আবরণ উন্মোচন করিয়া তাহার পূর্ণতা বিকাশের সহায়ক হয়। তিনি বলেছেন—যে শিক্ষায় চরিত্র গঠন হয়, মনের শক্তি বৃদ্ধি পায়, বুদ্ধির বিকাশ ঘটে, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে সেই শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা। রুশো বলেছেন—"Education is the unfoldment of the child. It is the skill of human behaviour pattern". সক্রেটিস বলেছেন—"Education is self realisation". শিক্ষা এক ধরনের জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া যা মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত চলে। যার বিবর্তন আছে কিন্তু ছেদ নেই। শ্রদ্ধা ও আত্মবিশ্বাসই মানুষকে শক্তিশালী করিয়া তোলে, ইহা স্বামীজীর ভাষায়—"Man making education"—প্রকৃত মানুষ গড়ে তুলিবার প্রকৃষ্ট উপাদান। আধুনিককালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র, কাজীনজরুল, স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ, রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রমুখ মনীষীবৃন্দ তাঁদের অসাধারণ জ্ঞানবত্তার ফলে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। স্বামীজি বলেছেন—চালাকির দ্বারা জগতে কোন মহৎ কাজ হয় না। জগৎ উদ্ধারের পথ হল মানুষ হওয়া। বর্তমানে শিক্ষার অবক্ষয় প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে। সর্বত্র দলবাজি, স্বজনপোষণ, মিথ্যাচার, তোষণ, অসৎপথে অর্থ উপার্জন ও রাজনীতি।

শিক্ষার ব্যাপক প্রসারই যে কোন সরকারের প্রথম ও সর্বোত্তম কর্তব্য বলে বিবেচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

হারবার্ট স্পেনসারের কথায়—'শিক্ষার উদ্দেশ্য হল চরিত্র গঠন।

জন জ্যাকুইরুশো বলেছেন—পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভে আমাদের যা কিছু দরকার সে সবই পূরণ করতে পারে শিক্ষা।

ফ্রেডরিক হেগেল বলেছেন—শিক্ষা মানুষের মধ্যে নৈতিকতা সঞ্চারিত করার উপায়। শিক্ষা শিক্ষার্থীর নবজন্মের পথ দেখায়, প্রবৃত্তির স্তরকে নিয়ে যায় উন্নততর মননশীল স্তরে।

সক্রেটিস বলেছেন—শিক্ষার লক্ষ্য হল, ভুল দূর করা এবং সত্য আবিষ্কার করা।

অ্যারিস্টটলের কথায়—একজন মৃত ও জীবিত মানুষের মধ্যে যতটা পার্থক্য, অশিক্ষিত ও শিক্ষিত মানুষের মধ্যে পার্থক্য ঠিক ততটাই।

গোপালকৃষ্ণ গোখলের মতে—একটা অজ্ঞ ও নিরক্ষর জাতি, কখনই সমাজে প্রগতি আনতে পারে না এবং জীবন যুদ্ধে তারা পিছিয়ে যেতে বাধ্য।

সাবিত্রী বাই ফুলে বলেন—জ্ঞান সবসময়ই বিকশিত হতে চায়—জ্ঞান হচ্ছে আগুনের মতো যা প্রথমে কাউকে বাইরে থেকে জ্বালিয়ে দিতে হয়। তারপর নিজেই বিস্তার লাভ করতে থাকে।

ধর্মীয় অন্ধতা, কূপমণ্ডুকতা শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস বলেছেন—বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা আমাদের শত্রু নয়। শত্রু আমাদের অন্তরে—তাহলো ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি বিদ্বেষ।

আব্রাহাম লিঙ্কন বলেছেন—আমি সেদিনের অপেক্ষায় আছি, যেদিন শিক্ষা আজকের চেয়ে অনেক বেশী সর্বজনীন হয়ে উঠবে।

মার্টিন লুথার বলেছেন—রাজপুত্র এবং অভিজাত ব্যক্তিদের ছাড়া আমাদের চলতে পারে। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া আমরা চলতে পারি না। কারণ দুনিয়া পরিচালনা করে শিক্ষা।

মহাত্মা গান্ধীর কথা—জাতীয় শিক্ষার চরিত্রধর্ম হল এই যে, শিক্ষা হবে অবৈতনিক। শিক্ষাকে যেন অর্থ নির্ভর হতে না হয়। সূর্য যেমন সকলকে সমানভাবে কিরণ দেয় এবং বৃষ্টির ধারা যেমন সবার জন্য ঝরে পড়ে, শিক্ষাও তেমনি সকলের জন্য সহজলভ্য হবে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বলেছেন—ধর্মের নামে, দেশের নামে বা রাজনীতির নামে কোন প্রকার গোঁড়ামি যেন আমাদের শিক্ষামন্দিরে প্রবেশ করতে না পারে, সেদিকে আমাদের দৃষ্টি রাখা উচিত।

আমার মনে হয় সচ্চরিত্রবান, আদর্শনিষ্ঠ, দক্ষ, যোগ্যতা সম্পন্ন উপযুক্ত নিরপেক্ষ শিক্ষাবিদ, সুশাসক ও প্রশাশকদের শিক্ষা কমিশন গঠন করে ভারতবর্ষ তথা রাজ্যগুলিতে কর্মমুখী জীবনদায়ী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন করতে হবে। শিক্ষা বাঁচলে উন্নয়ন, শিল্প-বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, পরিবেশ-পরিকাঠামো গতিশীল ও প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠবে। সর্বত্র নারী জাতির সম্মান-মর্যাদা অক্ষত ও অটুট রাখতে হবে। নারী জাতির কল্যাণ ছাড়া দেশ তথা ভারতের কল্যাণ হবে না। দেশের ঐক্য, অখণ্ডতা, সংহতি, শান্তি, প্রগতি ও অগ্রগতির জন্য শিক্ষাকে হাতিয়ার করতে হবে। যুযুধান জাতীয়তাবাদী শক্তির অবলুপ্তি ঘটিয়ে আমাদের কাম্য হোক সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠা। প্রতিকার ও প্রতিবাদী অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধদের অনুপ্রাণিত করে সমাজ ও রাষ্ট্রের সংহতি ও স্থায়িত্ব সুদৃঢ় করতে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে হবে। আমাদের মন্ত্র হবে কবিগুরুর রাখীবন্ধন, বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবোধ, গান্ধীজির অহিংসা ব্রত, নজরুলের একই মন্ত্রে দুটি কুসুমের মিলন, নেতাজীর স্বরাজ গঠন, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সেবাব্রত, রামমোহন-বিদ্যাসাগরের স্ত্রীজাতির সতীত্ব রক্ষা, মা সারদার মাতৃত্ব বন্দনা, ভগিনী নিবেদিতার ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করা। সর্বোপরি ভারতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী দুই মহাকাব্য মহাভারত ও রামায়ণের দুই যুগনায়ক শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের আদর্শ ও অনুপ্রেরণা এবং গৌতম বুদ্ধের এবং শ্রীচৈতন্যের ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে কলুষতা, অশালীনতা ও কুসংস্কার দূরীভূত হোক ভারতবর্ষ ও রাজ্যগুলি স্ব স্ব মহিমায় জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠত্বের আসনে গৌরবান্বিত হোক। এটাই আমাদের কাম্য হোক। ওঁ শান্তি। ওঁ শান্তি। ওঁ শান্তি।

গহরজান : একটি জীবন ও অফুরন্ত বিস্ময়

দেবজ্যোতি রায়

হিন্দুস্থানি ধ্রুপদী সংগীতের বিভিন্ন রূপ ও রীতিতে বিরল সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কিংবদন্তী শিল্পী গহরজান। যেমন তাঁর প্রতিভা তেমনি বিপুলবিস্তৃত শিক্ষা। অন্তত দশটি ভাষায় সংগীত পরিবেশন করতে পারতেন। তাঁর গাওয়া গানের রেকর্ডের সংখ্যা আনুমানিক ৬০০। তিনিই প্রথম ভারতীয়, যাঁর কণ্ঠের সংগীত রেকর্ড করে গ্রামাফোন কোম্পানি। ১৯০২ সালে। খেয়াল, ঠুংরি, দাদরা, কাজরি, তারানা, গজল, ভজন, ধ্রুপদ, ধামার—প্রায় সব ধরনের সংগীত রীতিতে ঝরে পড়েছে আশ্চর্য কণ্ঠমাধুর্যের ঐশ্বর্য। কত রাজা, জমিদার, বাবুসমাজ, ধনাঢ্য ব্যক্তি, সংগীতরসিক ছিলেন তাঁর মুগ্ধ শ্রোতা। আর রূপলাবণ্যে যেমন সাক্ষাৎ অপ্সরা। সে যুগের বিখ্যাত ওস্তাদদের কাছ থেকে পাঠ নিয়েছেন বিচিত্র ধারার সংগীতের। কত্থক নৃত্যের লখনৌ ঘরানার স্রষ্টা পণ্ডিত বৃন্দাদিন মহারাজের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। পণ্ডিত বৃন্দাদিন মহারাজ সম্পর্কে পণ্ডিত বিরজু মহারাজের দাদু। গহরজানের নৃত্যকলার অলৌকিক তরঙ্গ কত জলসা, মহফিল ও বাগানবাড়িকে মুগ্ধবিস্মিত করেছে। সেই সুষমা যেন অপার্থিব। কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার ঘোষবাড়ি সংগীতের পৃষ্ঠপোষকতা ও তারিফের জন্য সুবিখ্যাত। ভারতের নামজাদা ও ওস্তাদরা সেখানে আসেন সংগীত পরিবেশন করতে। মালকাজান কোনো এক নবমীর রাতে পাথুরেঘাটার ঘোষবাড়ির আসরে আমন্ত্রিত। সঙ্গে গহরজানও যাবেন। তিনি তখন কিশোরী। সেবার সপ্তমীর দিন মালকাজান ও গহরের অনুষ্ঠান ছিল শোভাবাজারের দেববাড়িতে। রাজা নবকৃষ্ণ দেবের জাঁকজমক, সমঝদারি ও বিলাসিতার পরম্পরা বহন করছে দেববাড়ি। কিন্তু ঘোষবাড়ির সংগীতসভার ঐতিহ্য বিভিন্ন প্রদেশের নামী ওস্তাদদের সম্মিলনে সমৃদ্ধ। তাই আলাদা প্রস্তুতি নিয়েছেন বড়ি মালকাজান, গহরের মা। ওস্তাদজির কাছে রেওয়াজ করেছেন গহরজানও। অনেক রাতে গহর এলেন মায়ের ঘরে। মাকে বললেন—'আমি ঘোষবাড়িতে বাংলা গান গাইব'। বড়ি মালকাজানের আশঙ্কিত উত্তর—'শেষে একটা কেলেঙ্কারি হবে! কী সব পাগলের মতো ভাবছিস!' গহর তখন মাকে শোনালেন যদুভট্টর গানের সরগম। খালি গলায় গানের দু-এক কলি শুনে মা স্তম্ভিত। মেয়ের প্রতিভায় বাক্যহারা। আনন্দিত হয়ে সম্মতি দিলেন। নতুন রীতির শিক্ষাকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ ও অবিস্মরণীয় ভঙ্গিতে পরিবেশনের সামর্থ্য ছিল গহরজানের।

নতুন চ্যালেঞ্জ নতুনভাবে আবিষ্কার করতেন নিজেকে। তাই বাংলা, হিন্দি, উর্দু, গুজরাটি, মারাঠি, তামিল, আরবি, ফারসি ছাড়াও ফরাসি ও ইংরেজ গানে তিনি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। গানের বহুমুখী ভাষা ও ঘরানা তাঁর সুরে মোহজাল বিস্তার করত। তুলনাহীন জনপ্রিয়তা ও প্রাচুর্য অর্জন করেছিলেন। ছিল খামখেয়ালিপনা, বিলাসিতা। ছয় ঘোড়ায় টানা ফিটন গাড়ি চড়তেন। যা পরাধীন ভারতে ব্রিটিশদের চোখে ঔদ্ধত্য। এজন্য তাঁকে ১০০০ টাকা জরিমানা দিতে হয়েছিল। তবু ফিটন গাড়ি ছাড়েননি। তাঁর জনপ্রিয়তা এতদূর বিস্তৃত ছিল যে পোস্টকার্ড, দেশলাইবাক্স ইত্যাদিতে ছবি ছাপা হতো। সান্নিধ্য লাভের জন্য ছিল শ্রোতৃমণ্ডলীর অধীর প্রতীক্ষা। ১৮৮৭ সালে বিহারের দারভাঙা রাজসভায় মাত্র ১৪ বছর বয়সে তাঁর সংগীতজীবনের আত্মপ্রকাশ। সাফল্যের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবনের নিঃসঙ্গতা ও বেদনা আর্ত করেছে গহরজানের ৫৭ বছরের অবিস্মরণীয় জীবন। অনেক ভাঙা-গড়া, উত্থান-পতন, নাটকীয়তায় ভরা জীবনের ক্যানভাস বিচিত্র রঙে রক্তিম, আবার কখনও ধূসর। চারদিকে উজ্জ্বল আলোর রোশনাই। অন্যদিকে একাকিত্বের অন্ধকার। তুমুল তারিফ, করুণ বিষণ্ণতা। খাতির ও প্রতারণা। যাঁর নৃত্য, সংগীত, শরীরী বিভঙ্গ তামাম ভারতকে আলোড়িত, পুলকিত করেছে। তিনিই অন্তরালে যাপন করেছেন অতৃপ্তি ও রক্তক্ষরণের জীবন। ইতিহাস

গহরজানকে চিহ্নিত করেছে আশ্চর্য প্রতিভার বিস্ময়ে। সমকাল অতিক্রম করে যাওয়া গায়িকা ও নৃত্যশিল্পী হিসেবে।

গহরজানের সার্ধশতবর্ষ সদ্য পার হলো। এখনও তাঁর জীবনরহস্য ও প্রতিভা নিয়ে ভারতবাসীর পর্যাপ্ত কৌতূহল। তাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ। সম্প্রতি প্রকাশিত বিক্রম সম্পদ রচিত—'MY NAME is GAUHAR JAAN!' The Life and Times of A Musician। এই গ্রন্থের ভূমিকায় ভুবনবিখ্যাত সরোদশিল্পী ওস্তাদ আমজাদ আলি খান তুলে ধরেছেন তাঁর বাবা ওস্তাদ হাফিজ আলি খানের সমসাময়িক শিল্পী গহরজান সম্পর্কে সশ্রদ্ধ মূল্যায়ন ও স্মৃতিচারণ—'Gauhar Jaan was a legend even her own life time and commanded a huge amount of respect in the music circles of the time'. ওস্তাদ আমজাদ আলি খানও অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন গহরজানকে—'the colourful life of one of the most successful and historically important singers of thie century.' গায়ক ও নতৃশিল্পীর পরিচয়ের পরেও গীতিকার গহরজান সম্পর্কে অনেক গুণী মানুষ আপ্লুত ছিলেন। তাঁর লেখা ঠুংরি আজও আবেশ ছড়ায়। পণ্ডিত যশরাজ বলছেন—'As a matter of fact thumries written by Gauhar Jaan......are still sung today by many across India.' ভারতশ্রেষ্ঠ বাইজির জীবনে সম্মান ও প্রাপ্তির অভাব ছিল না। পতঙ্গের মতো কত রাজপুরুষ তাঁর রূপবহ্নিতে ঝাঁপ দিতে চাইতেন। কিন্তু মোহান্ধের স্তুতি তাঁকে ক্রমশ ক্লান্ত করেছে। আজীবন গভীর নিঃসঙ্গতা ও ভেতরে ভেতরে রিক্ত মনের বিপন্নতা বহন করেছেন গহরজান।

গহরজানের জীবনকথা নাটকীয়তায় ভরা, চমকপ্রদ। তাঁর মা, সে যুগের বিখ্যাত বাইজি, নর্তকী ও গায়িকা বড়ি মালকাজানের আদি নাম ছিল ভিক্টোরিয়া হেমিংস। তখন তিনি ধর্মমতে খ্রিস্টান। ভিক্টোরিয়া হেমিংসের মা রুকমিনি এবং বাবা ব্রিটিশ সৈনিক হার্ডি। ১৮৭২ সালের ১০ সেপ্টেম্বর এলাহাবাদের হোলি ট্রিনিটি চার্চে আর্মেনিয়ান সাহেব রবার্ট উইলিয়াম ইওয়ার্ডের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন ভিক্টোরিয়া হেমিংস। বিয়ের সময় ভিক্টোরিয়ার বয়স ১৫, আর ইওয়ার্ড ২০। ইওয়ার্ড পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, চাকরি করতেন বরফকলে। তাঁদের একমাত্র মেয়ের জন্ম ১৮৭৩ এর ২৬শে জুন, উত্তরপ্রদেশের আজমগড়ে। জন্মের দু'বছর পর এলাহাবাদের মেথডিস্ট গির্জায় মেয়েকে ব্যাপটাইজ করানো হলো। তার নাম রাখা হলো অ্যালেন অ্যাঞ্জেলিনা ইওয়ার্ড। পরবর্তীকালের গহরজান। এর কিছুদিন পর ইওয়ার্ড স্ত্রীর বিরুদ্ধে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা আনেন। ১৮৭৯ সালে ঘটে বিবাহবিচ্ছেদ। মেয়ে রইল মায়ের হেফাজতে। আজমগড়ে তাঁদের জীবন ছিল অত্যন্ত দারিদ্র্যপীড়িত। এই বিপদের সময় খুরশেদ নামে এক ব্যক্তি ভিক্টোরিয়ার পাশে এসে দাঁড়ান। খুরশেদের পরামর্শেই আজমগড় ছেড়ে তাঁরা চলে এলেন বেনারস। সেখানে ধর্মান্তরিত হলেন ভিক্টোরিয়া। গ্রহণ করলেন ইসলাম ধর্ম। নতুন নাম বড়ি মালকাজান। মালকাজানের নবজন্মের কারিগর তাঁর নিভৃত প্রেমিক খুরশেদ। একদিন ভাগ্যান্বেষণে বেনারসের বাইজি মহল্লা ছেড়ে কলকাতায় পদার্পণ মালকাজানের। সঙ্গে মেয়ে গহরজান ও সখা-সচিব-প্রেমিক খুরশেদ। সাল ১৮৮৩। কলুটোলার কাছে একটি পুরোনো বাড়িতে বাসা বাঁধলেন। অভিভাবক খুরশেদ একদিন নিহত হলেন। মা ও মেয়ের জীবনে নেমে এল অনিশ্চয়তা। কিন্তু সময় থেমে থাকে না। একটি বিপদ থেকে জীবন সরে যায় অন্য প্রস্তুতির দিকে। ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস অপেক্ষা করছে গহরজানের জন্য। ধীরে ধীরে কলকাতার সীমানা ছাড়িয়ে ভারতব্যাপী খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে গহরজানের।

কলুটোলার বাড়িতে কিছুদিন পর চলে এলেন মালকাজানের পুরোনো পরিচারিকা আশিয়া, তাঁর ছেলে ভাগলুকে নিয়ে। আশিয়া অত্যন্ত বিশ্বস্ত। অনেক বৈভবের মালিক মালকাজান এমন একজন বিশ্বস্ত পরিচারিকার ওপর নির্ভর করতে চাইছিলেন। কিছুদিন পর কেনা হল ৪৯ চিৎপুর রোডে, নাখোদা মসজিদের কাছে একটি বিলাসবহুল হর্ম্য। কলুটোলা ছেড়ে নতুন বাড়িতে স্থানান্তরিত হলেন সপরিবার মালকাজান। চিৎপুর রোডের বাড়ি মালকাজান ও গহরের

অনেক সাফল্য ও গরিমার সাক্ষী। অনেক রাজা জমিদার বাবুদের উপস্থিতিতে ঝলমলে আসর বসেছে এই বাড়িতে। কলকাতা মা ও মেয়েকে প্রবাদপ্রতিম খ্যাতি দিয়েছে। এই শহর ও বিভিন্ন রাজ্যে আসরের পর আসর মন্দির হয়ে উঠেছে তাঁদের সুরঝংকারে, নৃত্যের তালে। ক্লান্তি ও মদের নেশা বড়ি মালকাজানকে অত্যন্ত অসুস্থ করে তুললেও নেশা ছাড়তে পারেননি তিনি। ১৯০৬ সালে পাড়ি দিলেন জগৎ সীমার ওপারে। মায়ের মৃত্যু গহরজানকে যেমন বেদনার্ত ও নিঃসঙ্গ করে, তেমনি অসহায় করেছিল। তবু জীবনের নিয়মেই চলতে থাকে তাঁর সংগীতের আসর, মুজরো, গ্রামাফোন কোম্পানির রেকর্ড। গহরজানের স্বীকৃতি ও ঐশ্বর্য বাড়তে থাকল। কিন্তু শত্রু তৈরি হলো বাড়ির ভেতরেই। মালকাজানের আশ্রিত ও পরমস্নেহে পালিত ভাগলুই আশিয়াও মালকাজানের মৃত্যুর পর সম্পত্তির লোভে গহরজানের জীবন ভয়াবহ রকম অতিষ্ঠ করে তুললেন। ভাগলুর দাখিল করা মিথ্যা মামলায় বিপর্যস্ত সংগীতসম্রাজ্ঞীর জীবন। নানা অপকৌশলে তিনি মালকজান ও গহরজানের বিপুল সম্পত্তি আত্মসাৎ করতে চায়। ১৯১০ সালে হাইকোর্টের শমন পান গহরজান। ভাগলুর অ্যাটর্নি জি. এন. দত্ত অ্যান্ড কোম্পানি। আদালতে ভাগলুর আবেদন, তিনি মালকাজানের একমাত্র বৈধ সন্তান। ১৮৬৮ সালে তাঁর বাবা শেখ ওয়াজির ও মালকাজানের বিয়ে হয়। নর্তকীর পেশা গ্রহণের পর মালকাজান কিছুদিন একজন আর্মেনিয়ার সাহেবের রক্ষিতা ছিলেন। তাঁদের অবৈধ সন্তান গহরজান। আর্জিতে ভাগলু আরও জানান ১৯০৬ সালে মালকাজান মৃত্যুর সময় কোনো উইল করে যাননি। তাই একমাত্র বৈধ পুত্র হিসেবে আইনত সমস্ত বিষয় সম্পত্তির মালিক ভাগলু। স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির একটি তালিকাও ভাগলু আদালতে পেশ করেন।

গহরজানের অ্যাটর্নি গণেশ চন্দ্র চন্দ্র বুঝতে পারলেন একটি বিরাট ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করা হয়েছে। মামলাটিও অত্যন্ত জটিল, কারণ মামলার কেন্দ্রে রয়েছে একজন দেহপসারিনীর জীবন, যে জীবন নিয়ে সহজেই বিতর্ক সৃষ্টি করা যায়। ইতোমধ্যে গহরজানের জীবনে নেমে আসে আরও বৈরিতার অভিজ্ঞতা। বাড়ির পুরোনো ম্যানেজার ওয়াজির হাসান, দারোয়ান দিল নারায়ণ গহরজানের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত। পারিবারিক চিকিৎসক ও অত্যন্ত শুভানুধ্যায়ী ডাক্তার মাসুম এসব জানতে পেরে অত্যন্ত বিচলিত বোধ করেন। ডাক্তার মাসুম গহরজানের জন্য একজন ম্যানেজার নির্বাচন ক'রে ভাবলেন এই ছেলেটি শিক্ষিত, মার্জিত ও দায়িত্বশীল—গহরজানকে সুরক্ষা দিতে পারবে। নাম সৈয়দ গোলাম আব্বাস। একজন পেশোয়ারি। গহরজানের পিতৃপরিচয় ও সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা জেতার জন্য ভাগলু অনেক মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণ জোগাড় করলেন। গণেশ চন্দ্র চন্দ্র এই স্মরণীয় মামলায় সমানতালে লড়ে গেলেন। আর নতুন ম্যানেজার আব্বাসও প্রচুর পরিশ্রম করে প্রকৃত সহকারীর ভূমিকা পালন করতে থাকেন। এরই মধ্যে পেশাগত কারণে প্রচুর অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে হয় গহরজানের। কলকাতার বাইরেও যেতে হয়। বিখ্যাত সারেঙ্গি বাদক এনায়েৎ আলিকে নিয়ে গেলেন হায়দ্রাবাদের নিজামের বাড়ির সংগীতানুষ্ঠানে। সর্ষের মধ্যে ভূত প্রবাদের প্রতিফলন আমরা দেখব গহরজানের জীবনে। একদিন গোলাম আব্বাসকে বিশ্বাস করে প্রেমিকের মর্যাদা দিয়েছিলেন তিনি। তারপর সেই প্রেমিকের কাছ থেকে পেতে হল প্রবল প্রতারণা। মামলা চলতে থাকে বিচারপতি হ্যারি লাশিংটন স্টিফেনের এজলাসে। গহরজানকে দেখবার জন্য আদালতে ভিড় উপচে পড়ে। সাক্ষ্যগ্রহণ পর্ব চলে কলকাতা থেকে আজমগড় পর্যন্ত। হাইকোর্টের অনুমতি নিয়ে আজমগড়ে কমিশনার নিযুক্ত হয় এবং সেখানে ১৯১১ সালের ১১মে সাক্ষীদের জবানবন্দি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণ হয়ে যায়। গহরজানের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী ছিলেন তাঁর জন্মদাতা পিতা রবার্ট ইওয়ার্ড। তিনি এলাহাবাদ থেকে এসে আদালতে দাঁড়িয়ে নিজের পিতৃত্বের কথা ঘোষণা করেন। ১৯১১ সালের ১০ অগাস্ট বিচারপতি স্টিফেন ভাগলুর মামলা খারিজ করে দেন। গহরজানের জীবনের এই বেদনাবিধুর নাটক কলকাতা হাইকোর্টের ধূলিধূসরিত নথিপত্রে আজও মর্মরিত।

৪৯ চিৎপুর রোডের বাড়িতে বিরাট উৎসব হল মামলা জয়কে কেন্দ্র করে। এলেন কসাইটোলা, বউবাজার ও জানবাজারের সেরা বাইজিরা। এলেন প্রিয় বন্ধু, বাইজি বদরে মুনির চৌধুরান। সঙ্গে রেহানা সুলতানা, কাঞ্চনমালা, দুলারি বিবি প্রমুখ। কলকাতার বাবুসমাজের একটি বড় অংশ, অনেক গায়ক, বাদক, কয়েকজন দালালও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। বিচারপতি স্টিফেনের রায়ের বিরুদ্ধে ভাগলু আপিল করেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্যের জয় হয়। অন্যদিকে আব্বাসের প্রতি আকর্ষণের মোহ গহরজানকে অস্থির করে তোলে। তিনি তখন সমর্পিতপ্রাণ। কোনো চাতুর্য বিচার করার মানসিক অবস্থা তাঁর নেই। আব্বাসকে নিঃশর্তে বিশ্বাস করতে থাকেন। আব্বাস কথা দেন—আমি তোমার জীবন মরণের সাথী হয়ে থাকব। ইসলামি রীতি অনুযায়ী তাঁদের 'মুতা' বিবাহ হল। আব্বাসের সঙ্গে মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে গেলেন কলকাতা ছেড়ে বোম্বাই। এরপর ভাবাবেগে একটি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলেন সংগীত সম্রাজ্ঞী। ৪৯ চিৎপর রোডের বহু স্মৃতি বিজড়িত বাড়ি আব্বাসের নামে দানপত্র করে দিলেন। আব্বাসের বাবা মেহেদি খান ছিলেন অত্যন্ত ধূর্ত। তিনি পুত্রকে নানা কুটিল ফন্দি শেখাতেন। ১৯১৪ সালের গোড়ার দিকে গহরজান ২২ নম্বর বেন্টিং স্ট্রিটের বাড়ি বিক্রি করে ৪৬ নম্বর ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে একটি ছোটখাট বাড়ি কিনলেন। নিভৃত নির্জনতায় বাস করার জন্য। কিন্তু ভবিতব্য তাঁর জন্য অনেক সংকট নিয়ে অপেক্ষা করছিল। যে আব্বাসকে সামান্য কর্মচারী থেকে তিনি স্বামিত্বে বরণ করেছিলেন, তাঁর অর্থলোভী মন গহরজানের ঐশ্বর্য আত্মসাৎ করার কাজে তৎপর। ক্রমশ সব বুঝতে পারলেন গহরজান। তাঁর ব্যাংকের টাকা রহস্যজনকভাবে নিঃশেষ। তিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। মনোবেদনায় ক্ষতবিক্ষত।

গহরজান আবার নতুন করে বোম্বাই ও হায়দ্রাবাদে বিভিন্ন আসরে গাইতে শুরু করলেন। প্রায় ছ-মাস তিনি কলকাতার বাইরে, কিন্তু তাঁর চিত্তচাঞ্চল্য প্রশমিত হলো না। প্রবাস থেকে তিনি যে চিঠিগুলি আব্বাসের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন তা প্রমাণ করে তাঁর মনের অস্থিরতা। কলকাতায় ফিরে আব্বাসের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। চিৎপুর রোডের যে বাড়িটি দানপত্র করে দিয়েছিলেন, সেই দানপত্র প্রত্যাহার করতে চান। দু-বছর ধরে মামলা চলে। ১৯১৮ সালে আপোস-রফায় মামলার নিষ্পত্তি হয়। নিষ্পত্তির শর্তগুলি গহরজানের পক্ষে সন্তোষজনক না হলেও, আব্বাসের সঙ্গে সম্পর্কের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন ক'রে গহরজান ফিরে আসেন গানের জগতে। জীবন থেকে পাওয়া আঘাত-বেদনায় তিনি বিষণ্ন, অবসাদগ্রস্ত। তিনি এখন নির্বাচিত কনসার্টে অংশগ্রহণ করেন। বেশি মানুষের সঙ্গে ভালো লাগে না। ভগ্নহৃদয়ে সময় কাটে। গহরজানের সে সময় অর্থের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তাই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিতেই হত। এরই মধ্যে গান্ধীজির আবেদনে সাড়া দিয়ে কনসার্ট থেকে প্রাপ্ত অর্থ দেশের প্রয়োজনে দান করলেন। কলকাতা গহরজানের রঙিন স্বপ্নের শহর, প্রিয় বাসভূমি। তবু একদিন কলকাতা ছেড়ে চলে গেলেন দেশের অন্যপ্রান্তে। ১৯২৮ সালে ডাক এল মহীশূর রাজদরবার থেকে। সভা-গায়িকার পদ গ্রহণের আমন্ত্রণ। সম্মতি জানালেন গহরজান। কলকাতায় স্থায়ী বসবাসের অবসান ঘটল। জীবন তখন ব্যথাদীর্ণ। ভগ্নস্বাস্থ্য। ১৯৩০ সালের ১৭ জানুয়ারি মহীশূরে প্রয়াণ ঘটল ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পীর। একটি যুগের সমাপ্তি। গহরজান যে ঐতিহ্য ও সংগীতের ধারা প্রতিষ্ঠা করে গেলেন, তা যাতে সংরক্ষণের অভাবে কালের গর্ভে লীন না হয়—সেই দায়িত্ব ভাবীকালের। সার্ধশতবর্ষে গহরজানের সৃষ্টি সংরক্ষণের প্রয়াসই হবে তাঁর প্রতি সবচেয়ে বড় শ্রদ্ধা নিবেদন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সঙ্গীতময় সৃষ্টিকর্মের অভিভাবক ও জীবননির্মাণ

ড. সুজিতকুমার বিশ্বাস (ডিস্ট্রিক্ট পেডাগগি কোঅর্ডিনেটর, সমগ্র শিক্ষা মিশন, নদীয়া)

"তোমায় নতুন করে পাব বলে হারাই ক্ষণে ক্ষণে
ও মোর ভালোবাসার ধন....."।
—কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলা সাহিত্যের বিশাল আঙিনা জুড়ে রয়েছেন আমাদের সকলের প্রিয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি আমাদের সকলের প্রাণের পুরুষ, আমাদের জীবনদেবতা। আমাদের বাংলা সাহিত্যে আধুনিক ধরার সূচনা করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রমুখ। যার ইতি টেনেছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সাহিত্যের সব ক্ষেত্রেই তাঁর হাতে সার্থক রূপায়ণ হয়েছে সামগ্রিকভাবে—এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বাংলা সাহিত্যকে নতুন অলংকারে ঐতিহ্যমণ্ডিত করে তিনি নতুন পথে এক সার্থক মাত্রা যোগ করে সৌন্দর্য ও সৌকর্য গড়ে তুলেছেন। তাঁর হাতে উন্মোচিত হয়েছিল মানব জীবনের নানা দিক, নানা আঙ্গিক। এখানে আমাদের আলোচনার বিষয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতময় জীবন ও তাঁর ভাবনা। যুগে যুগে প্রাণোদ্দীপক সঙ্গীতের মহাজীবন তিনি। তিনি আমাদের পরম চাওয়া ও পাওয়ার বিষয়—শুধু মনের টানে।

'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের 'গীতচর্চা' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নীচের কথাগুলি তাঁর সাংগীতিক ব্যক্তিত্ব নির্মাণের ভিত্তিভূমির এক অখণ্ড ইতিহাসের সজাগ ইঙ্গিত হিসাবে আজও আমাদের কাছে প্রেরণার বিষয়। তিনি লিখেছেন— "আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে গানচর্চার মধ্যেই আমরা বাড়িয়া উঠিতেছি। আমার পক্ষে তাহার একটা সুবিধা এই হইয়াছিল, অতি সহজে গান আমার সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার অসুবিধাও ছিল। চেষ্টা করিয়া গান আয়ত্ত করিবার উপযুক্ত অভ্যাস না হওয়াতে, শিক্ষা পাকা হয় নাই। সংগীতবিদ্যা বলিতে যাহা বোঝায় তাহার মধ্যে কোনও অধিকার লাভ করিতে পারি নাই"। এই কথাগুলি ছিল সঙ্গীত বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অনন্য আঁখর। যা প্রতি মুহূর্তে আমরা স্মরণ করি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্য ভুবনের উজ্জ্বলতম এক নক্ষত্র ছিলেন। এখানে তিনি সূর্যের মতোই প্রদীপ্ত ও তেজস্বী। তাঁর হিমাদ্রিসম কাব্যসাধনার একটা স্বর্ণখচিত দিক হল রবীন্দ্রসঙ্গীত। এখানে তিনি বিশাল এক উচ্চতার অধিকারী, এক বিশাল প্রতিভাধর ও স্রষ্টা, যা আমাদের কাছে অনন্ত আকাশের মতোই অসীমতার প্রতীক। আপামর জনবাসীর কাছে তাঁর গান নব প্রাণের সামিল। সাহিত্যের সাথে যাঁরা কমবেশি জড়িত তাঁদের অনেকেই এই বিষয়টি জানেন যে, বিশ শতকের সাহিত্যে প্রধান দিক ছিল। মানুষের নিঃসঙ্গতা ও বিচ্ছিন্নতা। প্রেম ও ভালোবাসার মধ্যে দ্যোতনা। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই দিকটি গভীরভাবে দেখেছেন একজন মনোজগতের মানুষ হিসেবে। কী আছে তাঁর সঙ্গীতে? যা আমাদের মনকে আজও এখনও টানে। আমরা আপ্লুত হই। আবেগে, ভাবজগতে ডুবে যাই। একই গান বাজতে থাকে আমাদের হৃদয়ে দিনের পর দিন। গানগুলি যেন শিশুমন থেকে শুনতে শুনতে আমাদের মুখস্থ হয়ে যায় চিরদিনের জন্য এক অন্য ভালোলাগা ছন্দে। বৈশাখ থেকে শ্রাবণ সর্বত্র বাজতে থাকে কবি গুরুর গান।

একই সময়ে একই সাথে তিনি গল্প, উপন্যাস, গান রচনা করছেন, কোনোটির সাথে কোনোটির মিল নেই।

এখানেই রবীন্দ্রনাথকে আমরা খুঁজে পাই। এই রকম প্রতিভা এই বিশ্বজগতে খুব কম জনেরই আছে। এ এক বিরল প্রতিভা। এক গল্পের সাথে আর এক গল্পের মিল নেই, এক উপন্যাসের সাথে আর এক উপন্যাসের কোনো মিল নেই। এক গানের সাথে আর এক গানের মিল নেই। এক নাটক নাটিকার সাথে অপরটির মিল নেই। এ এক বিস্ময় জাগানো প্রতিভা। তিনি যেন সময়ে সীমাবদ্ধ নন, সময়ের সীমা অতিক্রম করে তিনি মহানুভব ও আদর্শ ঋষিরূপে পরিচিত এই বিশ্বে। প্রতিটিই নতুন নতুন ভাবধারার প্রতীক।

আমার জীবনে বিশ্বকবি বা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান বা রবীন্দ্রসঙ্গীতের যে বিস্তৃত প্রভাব তা আমি কখনও ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। অসীম এই ব্যপ্তি জেগে থাক আমার হৃদয়ে। জগৎ সংসারের অনেক কিছুই ভালোভাবে বুঝে উঠবার আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা রবিঠাকুরের গান মিশে গিয়েছে আমার আত্মার সাথে। আমার রক্ত-মাংস, হাড়-মজ্জায়, প্রতি তন্ত্রীতে মিশে আছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধুর বাণী। রবীন্দ্রনাথের গান বা রবীন্দ্রসঙ্গীত শুধু যে আমারই সকল অনুভূতিতেই বেজে চলে আমার হৃদয় মাঝারে আমি তা বিশ্বাস করি না। আমি নিশ্চিৎভাবেই জানি, প্রতিটি বাঙালির অনুভূতি, চেতনায়, সকল আবেগ ও উপলব্ধিতে এই রবিঠাকুরের বাণীগুলি প্রভাবে ফেলে চলেছে প্রতিনিয়ত। মাঝে মাঝে মনে হয় উনি বুঝি আমাদের বুকের গভীরে বসেই লিখেছিলেন এক একটি পূজা, প্রেম, প্রকৃতি বা অনুভূতিরবাণী। এ নিতান্তই আমাদের স্বগতোক্তি। তাই বুঝি হৃদয়ে স্থান দিয়ে চলি বারবার। আর মনের অজান্তেই গেয়ে উঠি সেই সব মাধুরি জড়ানো কথা।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত গানের সংখ্যা ১৯১৫টি, দ্বিমতে ২২৩০টি। এই গানগুলিকে কয়েক পর্যায়ে ভাগ করা যায়। পূজা, প্রেম, প্রকৃতি, স্বদেশ বিবিধ রূপে সেগুলি চিহ্নিত। আমরা বলতে চাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্গীতের প্রায় সব পর্যায়কে স্পর্শ করেছেন। রাগসঙ্গীত, শ্যামাসঙ্গীত, ভক্তিমূলক গান, বাউলগান, মানব মানবীর বিশুদ্ধপ্রেম আবার ভগবান বা ঈশ্বরের প্রতি গভীর ভালোবাসায় সনাতন হিন্দুশাস্ত্রের বাইরে এসে এক অপূর্ব প্রেম ভালোবাসার গান। সবক্ষেত্রকে তিনি ছুঁয়ে গেছেন, তাঁর সারা জীবনে রচিত গানের মধ্যে। কোনো কোনো গান শুনলে মনে হবে তিনি মনে হয় মানবীকে ভালোবেসে তার উদ্দেশ্যে গানটি লিখেছেন। কিন্তু আমরা যদি গভীরভাবে সেই গানকে উপলব্ধি করি তাহলে বুঝতে পারব, আসলে তা নয়। তিনি ভগবানের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করে গানটি রচনা করেছেন। তাঁর সব গান নিয়ে আলোচনা করা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের সম্ভব নয়। তারপরও আমরা চেষ্টা করব। তার আগে একটি কথা বলে নেওয়া দরকার, তিনি কয়েকটি দেশের জাতীয়সঙ্গীতের রচয়িতা। তাঁর গানকে জাতীয়সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁর লেখা 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে' ১৯৫০ সালে স্বাধীন ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে স্বীকৃতি পায়। 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গানটি ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রচনা করেছিলেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে গানটির প্রথম ১০ লাইন জাতীয়সঙ্গীত হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। শ্রীলঙ্কার জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতাও কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবির লেখা 'নমো নমো শ্রীলঙ্কা মাতা' এই গানটি ১৯৫১ সালের ২২ নভেম্বর শ্রীলঙ্কার জাতীয়সঙ্গীত হিসাবে স্বীকৃতি পায়।

একটি স্থানে কথা প্রসঙ্গে কবিগুরু নিজেই বলেছেন, "আমার সব রচনা হারিয়ে যাবে, লোকে ভুলে যাবে একদিন, কিন্তু আমার গান থাকবে চিরকাল।" এখানে রবীন্দ্রনাথ বিরামহীন সাধক, সেবক, পূজারী, প্রেমিক এবং মহান হৃদয়ালোকের বর্তিকাবাহক মাত্র। এখানে তিনি মুক্ত মনে মুক্তির পথ নির্দেশক এক তপস্যারত পথিক। সৌরভের উৎসবেও মেঘহাওয়া মিলে মহাজীবনের গানে গানে বিধৃত 'গীতবিতান' তারই মহাসংকলন, যেখানে সব মত পথ

এসে হাত ধরাধরি করে মিশেছে বন্ধুত্বের প্রগাঢ় উষ্ণতায়। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যতানের মহান এক সুরে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকে তিনি বেঁধেছেন কৌশলী সৃষ্টিশীলতায়। তার গানের ভেলা যদি সাজানো যায় বিষয় বৈচিত্র্যের বিভাজনী ধারাপাতে, তাহলে আমরা দেখব, ঘর ও বাহিরের জটিল উপস্থিতি জীবনের পথে হেঁটেও তিনি নানা মনে নানা রং ছড়িয়ে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের গানে রয়েছে জীবনের নানা উপাদান। যা চিরস্থায়ী রূপ লাভ করেছে বাঙালিদের মনে। শুধু বাংলা ভাষাভাষী নয়, তাঁর গানের অনুবাদ ইংরেজিতে হয়েছে। বিশ্বব্যাপী সঙ্গীত পিপাসু মানুষের মনে রেখাপাত করে চলেছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভিতরে প্রাকৃতিক পরিবেশ তো আছেই, সেই সাথে আধ্যাত্মিকভাবে, ধর্মীয়ভাব মিশ্রণ আছে। প্রেম বিরহ ভালোবাসার এক সম্মিলন রয়েছে এই সব ছন্দে। সব মিলিয়ে তাঁর গান এক বিস্ময়কর অবস্থানে আসীন হয়ে আছে। শব্দ সুর এক হয়ে আমাদের মনের গভীরে প্রোথিত হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন—,"সুর অনির্বচনীয়ের প্রধান বাহন। কিন্তু মানুষ কেবল যে ব্যবহার্য সামগ্রীর সঙ্গেই অনির্বচনীয়কে প্রকাশ করতে চেয়েছে তা নয়। তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যাকুল হতে চেয়েছে। আপন সুখদুঃখ ভালোবাসার সহযোগে। অর্থাৎ যে সব শব্দ তার হৃদয়াবেগের সংবাদমাত্র দেয়, শিল্পকলার দ্বারা তার মধ্যে সে অসীমের ব্যঞ্জনা আনতে চায়। আদিকাল থেকেই মানুষ তাই শব্দের সঙ্গে সুরকে মিলিয়ে গান গেয়েছে।"

রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ সঙ্গীত ভাণ্ডারকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করলে দেখা যাবে, একটি গীতধর্মী, অর্থাৎ এক্ষেত্রে গানগুলির সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ রাগ সুর তাল লয় ইত্যাদি বিবেচিত হয়েছে। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের রচনাভাণ্ডারের এক বিরাট অংশ কাব্যধর্মী, যেখানে গানের কাব্যাংশের ভাবের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য অনুসারে সেগুলিকে আলাদা আলাদা পর্যায়ে ভাগ করা সম্ভব। কবির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল গানে কাব্যাংশকে গুরুত্ব দেওয়া। হিন্দুস্থানি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের নানা রকম বিধিনিষেধকে অতিক্রম করে কবি তার নতুন তাল এবং মিশ্র রাগের রচনাগুলিকে সৃষ্টি করেছেন। ফলে এই সময় থেকেই কাব্যধর্মী বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধি পেয়েছে। শেষ যুগে বা পরিণত সৃষ্টির যুগে আমরা পেলাম কবির স্বকীয় রচনাগুলি যেগুলো কথা ও সুরের রূপ। যা ছিল নবজীবনের সোপান। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানুষের এই শব্দসুরের ব্যঞ্জনায় গানের বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর গান আমাদের টানছে যুগের পর যুগ গভীরভাবে। রবীন্দ্রসঙ্গীত আমাদেরকে মুগ্ধ করে চলেছে। তাঁর গানের বাণীতে সুখদুঃখ, বিরহ, বিচ্ছেদ, বাউলতত্ব যা আধ্যাত্মিকতা নামে পরিচিত, ধর্মীয় দিকে সব কিছুই আছে।

বাক্য যা বলতে পারে না, গানের অমোঘ শক্তি তা পারে। যে কোনো গানেরই যদি সুর ভালো হয় আর গায়কী কণ্ঠ যদি সুমধুর হয় তাহলে সেই গান শুনতে সবারই ভালো লাগে, মনের মধ্যে গেঁথে যায়। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ধ্রুপদী ভারতীয় সঙ্গীত, বাংলা লোকসঙ্গীত, বাউল সঙ্গীতের সহযোগিতায় সঙ্গীত, ইউরোপীয় সঙ্গীতের ধারায় নিজ প্রতিভায় সুরশৈলী সৃষ্টি করেন। তাঁর গানের বাণীতে যে সুর করেন, সেই সুর ঝংকার তোলে মানুষের মনে। তিনি অনেক কবিতাকে সুর দিয়ে গানে রূপান্তরিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গান তো শুধুই রাগসঙ্গীত নয়। সেখানে কথা ও সুরের সমান সমান অধিকার। কথার প্রসঙ্গে যদি আসি, তাহলে দেখব রবীন্দ্রনাথ কথা ও সুরকে সমান অধিকার দিতে চেয়েছেন। অতএব, সুরের বিস্তার করতে গিয়ে বা তান করতে গিয়ে যদি কথার গুরুত্ব কমে তাহলে সেটা মেনে নেওয়া অসুবিধা। গানে কথা ও সুরের সমানাধিকারের কথা কবি বারবার বলেছেন।

রবীন্দ্রনাথ কখনও কোনো শর্তে বাঁধা পড়তেন না। কীর্তনগান তাঁকে আকৃষ্ট করে খুব অল্প বয়সেই। এই বয়সেই তাঁর হাতে আসে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' আর 'বৈষ্ণব পদাবলী'। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মূলত কীর্তনগান বিশেষভাবে

শোনেন পূর্ববাংলায় জমিদারি তদারক করতে এসে এবং তাঁর গানে কীর্তনাঙ্গের সুর বসানোর শুরু ও এই সময়ে প্রথম। স্বদেশ অংশে তাঁর গানগুলো দেশপ্রেমমূলক। সোনার বাংলাকে ভালোবাসা এবং বাংলায় জন্ম নিয়ে তাঁর জন্ম যে সার্থক হয়েছে সেভাবেই কবি উচ্চারণ করেছেন। আবার দেশমাতৃকার স্বাধীনতা ও গণজাগরণের জন্য যে সব গানকে এনেছেন, তেমনি বলেছেন অত্যাচারীর বাঁধন শক্ত হবে তত দ্রুতই সে বাঁধন ছিঁড়বে, দেশ মুক্ত হবে। দেশপ্রেমের সাথে দেশবাসীকে উজ্জীবিত করার জন্য এভাবে গানের কথায় সবার চিন্তার সাথে নিজেকে সংযুক্ত করেছেন। সবার মধ্যে নিজের মুক্ত ও মুক্তি চিন্তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর দীর্ঘদিনের কর্মজীবনে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংগীতের বিভিন্ন ঘরানার সঙ্গে পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়েছেন। কিন্তু বাংলার ঐতিহ্যবাহী বাউলগানের সঙ্গে তাঁর প্রতিভার মিশ্রণে যে পরীক্ষানিরীক্ষা তিনি চালিয়েছেন, তার ফসল একজন গীতিকার ও সুরকার হিসেবে তাঁকে এক নতুন উচ্চতায় বসিয়ে দিয়েছে। তাঁর সৃজনশীলতা মেশানো বাউলের প্রভাব সংগীত ছাড়াও অনেক কবিতা ও ছোটোগল্পের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে স্বীকার করেছেন—বাউলগান আর এই গানের দর্শন তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল।

তাঁর সকল গান সংকলিত হয়েছে গীতবিতান গ্রন্থে। এই গ্রন্থেপূজা প্রেম প্রকৃতি স্বদেশ আনুষ্ঠানিক ও বিচিত্র পর্যায়ের মোট দেড় হাজার গান সংকলিত হয়। পরে গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, নাটক, কাব্যগ্রন্থ ও অন্যান্য সংকলন থেকে বহু গান এই বইতে সংকলিত হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাঞ্জলি' তাঁর জীবন দেবতার চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি। এখানে বহু সংখ্যক বর্ষার গান রয়েছে। আমরা আগেই বলেছি, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের তাল-লয় আমাদের এই প্রবন্ধের মুখ্য আলোচনা নয়। আমরা তাঁর গানের বাণী নিয়েই এই কথা বলতে চাইছি। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই বিখ্যাত মরমি গানটি দিয়ে শেষ করতে চাই এই লেখাটি। যে গান মিশে আছে অনেকের মতো আমার হৃদয়ে।

'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে,
আমি বাইব না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে।
চুকিয়ে দেব বেচা কেনা,
মিটিয়ে দেব গো, মিটিয়ে দেব লেনা দেনা,
বন্ধ হবে আনাগোনা এই হাটে,
তখন আমায় নাইবা মনে রাখলে—

তথ্যসূত্র ঃ

১। সুকুমার সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলকাতা, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৬৯

২। পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৮১

৩। রবীন্দ্র পরিচয়, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৮২

৪। গীতবিতানের জগৎ, সুভাষ চৌধুরী, প্যাপিরাস, কলকাতা, ২০০৬

৫। রবীন্দ্রজীবনকথা, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৪১৪

৬। রবীন্দ্রসঙ্গীতকোষ, সুরেন মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যপ্রকাশ, কলকাতা, ১৪১৬।

ধ্বংসের পঙ্গাপাল বাসা বেঁধেছে

অসিম কুমার মাইতি

ধ্বংসের পঙ্গাপাল বাসা বেঁধেছে
বাসাটা আপাতদৃষ্টিতে দেখতে
কিন্তু বেশ ভালই লাগছে
পঙ্গাপালরা কতো কতো বছর ধরে
নতুন নতুন কায়দায় বাসা স্থায়ী করছে।

যখন যেমন তখন তেমন
বাস্তবতা ও অবাস্তবতা নিয়ে
একটা মৃত অশান্তচিত্র এঁকে চলেছে।
ধ্বংসের দোরগোড়ায় এসে
বিনাশের প্রহর গুনছে।

আপাতসময়ে পঙ্গাপালের বাসাটা
বেশ সাজানো—গোছানো মনে হয়।
ঘন অন্ধকার গাঢ় হলে
ফর্সা ফর্সা লাগার মতনই
কিন্তু সেটাতো মরীচিকা, আলো নয়।

দিগন্তের লাল লাল মেঘ
শোষণে-শাসনে চারপাশ ঘিরে রাখে
মধুর প্রলোভনে কেউ ভাঙতে সাহসী হয় না
কিন্তু ঐ পঙ্গাপালের বাসা
তোমাদের তো একদিন ভেঙ্গে ফেলতেই হবে।

ঝিনুক কুড়ানো

অসিম কুমার মাইতি

সাগরের ঝিনুক কুড়ানোর জন্য
সৈকতে ফুলে উঠে আছড়ে পড়া
সাগরের ঢেউয়ের মাথায়
নেচে নেচে ছুটে গিয়েছি।
ঝিনুকে যে মুক্তো আছে।

সাগরের ঝিনুক কুড়ানোর জন্য
মহাসাগরের ওপার থেকে
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে আসা
মহামিলনের গান শুনেছি
ও গানে যে মুক্তি আছে।

সাগরের ঝিনুক কুড়ানোর জন্য
সূর্য আলো দিয়েছে, চন্দ্র দিয়েছে জোছনা
অনেক অনেক ঝিনুক কুড়িয়েছি
এখন আমি শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন।

সাগরের ঝিনুক কুড়ানোর জন্য
মনের মাঝে এক উজ্জ্বল মন গড়তে চেয়েছি।
যেমন করে সুক্তির মাঝে মুক্তো হয়।
সেই মুক্তির খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত
আমি ঝিনুক কুড়িয়ে যাবো।

লোকসাহিত্য শিশু এবং মেয়েলি ব্রতকথা

তুষার কান্তি ষন্নিগ্রহী (উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতি)

এই বাংলার বুকে নদী যেমন শত ধারায় উৎসারিত সেই রকম লোক সাহিত্য শতধারায় বিরাজমান। চিত্তের অন্দরমহলে গাঁথা হয়ে আছে লোকসাহিত্য। মানুষের সুখ দুঃখ, আশা-আকাঙ্খা, কামনা-বাসনা, প্রতিফলিত হয়েছে লোকসাহিত্যে। কখনও গীত, কখনও ছড়া, কখনও আবৃত্তি কখনও বা গল্পরূপে লোকমুখে প্রচলিত লোকসাহিত্য। লোকসাহিত্যের মাধ্যমেই মানুষের চিরাচরিত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অভিব্যক্তি ঘটে। সমাজের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, শিল্প সাহিত্য সভ্যতাজনিত উৎকর্ষ সবকিছুর মধ্যেই মানবজাতির যে পরিচয় তাই তো সংস্কৃতি। সংস্কৃতির বিকাশে লোকসাহিত্যের ভূমিকাও কম নয়।

লোকসাহিত্য সবসময় হয়তো ঠিক শিল্পসম্মত বা ছন্দোবদ্ধ হয়নি। তা না হোক, মানুষের মনের অন্দরমহলে গোপন দরজা খুলে দিয়েছে লোকসাহিত্য।

দোলায়িত করেছে মানুষের প্রাণ ও মনকে।

লোকসাহিত্য কোন একক সাহিত্যিকের সৃষ্টি নয়। অসংখ্য মানুষের সম্মিলিত সাধনার ফসল। লোকসাহিত্যের ধারা বংশপরম্পরায় প্রবাহিত হয়। মানুষের জীবনপ্রবাহের বার্তা বহন করে। রঙীন কল্পলোকের দ্বারা উন্মুক্ত করে।

বাংলার ঘরে ঘরে লিখিত অলিখিত প্রচলিত অপ্রচলিত লোকসাহিত্যের যে কত নিদর্শন আছে তার ইয়ত্তা নেই। শিশুসাহিত্য, মেয়েলি ব্রতকথা, ধর্মসাহিত্য, সভাসাহিত্য, পল্লীসাহিত্য, প্রবচনসাহিত্য, ইতিবৃত্তিমূলকসাহিত্য ভরপূর লোকসাহিত্য।

স্বাধীনতা আন্দোলনে মুর্শিদাবাদ

প্রদীপ নারায়ন রায়

১৫ই আগস্ট, ২০২৪ সারা দেশ জুড়ে উদযাপিত হবে ভারতের ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস। স্মরণ করা হবে স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা সংগ্রামীদের। স্বাধীনতা সংগ্রামে মুর্শিদাবাদ জেলার ভূমিকার উপর আলোকপাতের প্রয়াসে এই পত্রের অবতারণা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়া পর্যন্ত এই জেলায় জাতীয় কংগ্রেস বা সশস্ত্র বিপ্লবী দলের কোনও অস্তিত্বর প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে মুর্শিদাবাদ জেলায় রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে জাতীয় কংগ্রেসের আত্মপ্রকাশ ঘটে। জাতীয় কংগ্রেসের সর্ব ভারতীয় নেতা হিসাবে এ জেলায় প্রথম আগমন ঘটে দেশবন্ধু

চিত্তরঞ্জন দাশের। স্বরাজ দলের সংগঠনকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যেই তাঁর এই আগমন। তার কয়েক বছর পরে মহাত্মা গান্ধী এ জেলায় আসেন তাঁর একান্ত সচিব মহাদেব দেশাইকে নিয়ে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সদ্য প্রয়াত দেশবন্ধুর স্মৃতি রক্ষা তহবিলে অর্থ সংগ্রহ। অবশ্য ইতিমধ্যেই ১৯২১-২২ সালের অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ এসে লেগেছে এ জেলায়। বহরমপুর, জিয়াগঞ্জ, রঘুনাথগঞ্জ, বেলডাঙা, পাটকেবাড়ি, পাঁচথুপি, সালার, কান্দি, মালিহাটি প্রভৃতি এলাকার মানুষ অসহযোগ আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। বহু ছাত্র সরকারি স্কুল ছেড়ে দেয়। বহরমপুর ও সালারে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় বিদ্যালয়। এর কয়েক বছর পরে ১৯৩০-৩১ এর আইন অমান্য আন্দোলন থেকেও মুর্শিদাবাদ জেলার মানুষ মুখ ফিরিয়ে থাকেননি। পাশাপাশি বিপ্লবী সংগঠন অনুশীলন সমিতির প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ বহরমপুর, জিয়াগঞ্জ, রঘুনাথগঞ্জে বহু তরুণ যুবককে বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করে তুলেছেন। সব মিলিয়ে এ জেলায় ব্রিটিশ বিরোধী মানসিকতা যথেষ্ট প্রসার লাভ করলেও এ কথা কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে, আইন অমান্য আন্দোলন কিন্তু এ জেলায় খুব জোরালো ভাবে দানা বাঁধেনি। আসলে এই আন্দোলন দমনে জেলা প্রশাসনের তরফে জোরালো কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। প্রতিরোধ, দমন, পীড়ন না এলে কোনও আন্দোলনই সেভাবে গতি পায় না। মুর্শিদাবাদ জেলার ক্ষেত্রে তাই-ই ঘটেছে। আর এই ঘটনার নেপথ্যে ছিলেন যিনি, তিনি হলেন জেলার তৎকালীন জেলাশাসক, যাকে সবাই এ ডি সাহেব বলতেন। আইন অমান্য আন্দোলন ও ১৯৪২ এর আগস্ট আন্দোলনের মধ্যবর্তী সময়ে মুর্শিদাবাদ জেলায় উল্লেখযোগ্য কোনও আন্দোলন সংগঠিত হয়নি। তবে কংগ্রেসের নানা মাপের নেতৃবৃন্দ দলীয় সংগঠনের স্বার্থে নানা জায়গায় সভা-সমিতি করেন। কংগ্রেসের আপোষ বিরোধী নেতা সুভাষ বসু ১৯২৭ থেকে ১৯৩৯ এর মধ্যে পাঁচবার মুর্শিদাবাদ জেলায় এসে কংগ্রেসের আপোষ বিরোধী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সভা, বৈঠক করেন। তবে ১৯৪২ এর আগস্ট আন্দোলনের আগে পর্যন্ত কংগ্রেসের রাজনৈতিক কার্যকলাপ মূলত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্তদেরই প্রভাবিত করেছিল। মূলত কৃষি নির্ভর এ জেলার অগণিত কৃষককে স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল স্রোতের দিকে টেনে আনার কোনও প্রয়াস ছিল না। ফলে গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেস সংগঠনের কোনও প্রভাব পড়েনি। আর শ্রমিক আন্দোলন তো সুদূর পরাহত। জেলাতে শ্রমিক তখন কোথায়? জেলাতে একটিও ছোট কারখানাও নেই। ত্রিরিশের দশকের শেষ দিকে জেলার মানুষ যখন বিদ্যুতের আলো দেখছে, তখন জেলায় শ্রমিক আন্দোলনের প্রশ্ন সোনার পাথরবাটির মতোই। জাতীয় কংগ্রেসের পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ জেলায় আর একটি শক্তি বিস্তার লাভ করেছিল মূলত যুবক শ্রেণির মধ্যে অনুশীলন সমিতির মাধ্যমে। বাংলায় বিপ্লববাদের কেন্দ্রস্থল চট্টগ্রাম, ঢাকা, বরিশাল প্রভৃতি জেলা থেকে অনেক ছাত্র বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে ভর্তি হতেন। অনুশীলন সমিতির নেতৃবৃন্দ কৃষ্ণনাথ কলেজকে সদস্য সংগ্রহের একটি নির্ভরযোগ্য কেন্দ্র হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। চট্টগ্রাম থেকে মাস্টারদা সূর্য সেন, ধুলিয়ান থেকে নলিনী বাগচী ভর্তি হয়েছিলেন এই কলেজে। কলেজের ভিতরে ও বহরমপুর শহরে তরুণদের মধ্যে অনুশীলন সমিতি ব্যাপক প্রসার লাভ করে। সমিতির সংগঠন ছড়িয়ে পড়ে জিয়াগঞ্জ, নিমতিতা, রঘুনাথগঞ্জ, কান্দি, ভরতপুর এলাকাতেও। তবে এ জেলায় অনুশীলন দ্বারা সংগঠিত কোনও বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপের প্রমাণ নেই। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ পর্যায়ের ঘটনা হল ১৯৪২ এর আগস্ট বিপ্লব। মুর্শিদাবাদ জেলার আবাল বৃদ্ধ বনিতা এই বিপ্লবে সামিল হন। বহরমপুর থেকে শুরু করে এ জেলার বেলডাঙা, পাটকেবাড়ি, রঘুনাথগঞ্জ, জিয়াগঞ্জ, আজিমগঞ্জ, লালগোলা, পাঁচথুপি, কান্দি, শক্তিপুর এলাকায় সমাজের সর্বস্তরের মানুষ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন। তবে ১৯৪২ এর অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি আগস্ট আন্দোলনের ঢেউ এ জেলায় থিতিয়ে আসে। ১৯৪২ থেকে '৪৭ র আগস্ট পর্যন্ত ভারত ঘটনাবহুল। ১৯৪৬ এর সারা ভারতের ডাক ও তার ধর্মঘট মুর্শিদাবাদ জেলাতেও সাফল্য লাভ করে। সরকারি কর্মচারীদের এই ধর্মঘট আসলে স্বাধীনতা আন্দোলনেরই এক অঙ্গ। ১৯২০ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত,

যেটাকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বর্ণযুগ বলা যায়, সেই সময় মুর্শিদাবাদ জেলার বহু নারী-পুরুষ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন, তেমনি জেলার এক বিরাট সংখ্যার মানুষ এই সংগ্রাম থেকে যে দূরে ছিলেন, তাও অস্বীকার করা যায় না। অপ্রিয় হলেও এটাই সত্যি যে, এই জেলার প্রায় দু হাজার গ্রামে যে বিপুল সংখ্যার হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কৃষক, ভূমিহীন খেতমজুর ছিলেন, তাদের উপরে স্বাধীনতা সংগ্রাম সদর্থক কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনি। (বিভিন্ন গবেষণামূলক প্রবন্ধ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংযোজিত)।

একশত পঁচিশ বর্ষ পূর্তির প্রাক্কালে কথাকার তারাশঙ্করের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

শ্রী জয়ন্ত প্রকাশ ভৌমিক

বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্করের আবির্ভাব বিশ শতকের তিন—এর দশকে, যখন ইউরোপের গুরু মহাশয়ের পাঠশালা থেকে জীবনবোধ, নতুন ভাবনার আমদানি এদেশের সাহিত্যে শুরু, ভারতীয় জীবন ভাবনায় যখন বিলিতিয়ানার পত্তন। বলতে পারা যায়—তাঁর সাহিত্যের কাল পরিবেশ জুড়ে রয়েছে আধুনিক সাহিত্যের পদচারণা, য়ুরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব। মোটামুটি এই বিংশ শতাব্দী তাঁর সাহিত্যের পটভূমি। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় (১) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনের উন্মেষ (১৯০৫), (২) গান্ধী যুগের অভ্যুদয় (১৯২১), (৩) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪), (৪) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯), (৫) মন্বন্তর (১৯৪৩) এবং (৬) দেশ বিভাগ জাত স্বাধীনতা (১৯৪৭)। পরপর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা মোটামুটি একই দেশে ঘটেছিল। প্রথম দুটির বিনিময়ে সমাজে এসেছিল দারুন বিপর্যয়, ক্ষুধা, প্রবঞ্চনা, কালোবাজারি আর বেকারি সকলের শেষে বহু আকাঙ্খিত হলেও খণ্ডিত দেশের স্বাধীনতা এই খণ্ডের সমাজ জীবনে আশার সঞ্চার করেনি। ফলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে চলা।—এই সমকাল আমাদের জীবনের সঙ্গে সুগ্রথিত। এই সমকালের মানুষ তারাশঙ্কর। জন্ম উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ১৮৯৮ সালের ২৩শে জুলাই এবং মৃত্যু ১৯৭১ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর এই জীবনকালের সীমায় বিংশ শতাব্দীর প্রত্যক্ষ প্রতিফলন থাকা বাঞ্ছনীয়। তবুও তারাশঙ্করের উপলব্ধিতে এর কিছুটা ব্যতিক্রম আছে তিনি নিজেই বলেছেন, "আমার সেকাল আর একালের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। চিরকালের একটি ধারা তার মধ্যে আমি দেখতে পাই চলমান ঘটনার আবর্তে সমাজের দৃশ্যপটে যেসব জোয়ার ভাটার ঢেউ উঠে আর তারই তীর ভাঙ্গা উচ্ছ্বাস আর কলতানে নতুনের আবির্ভাব।" শতাব্দীর সীমারেখায় এই উচ্ছ্বাস চলমান শতাব্দীকে নতুনভাবে সূচিত করে। বিংশ শতাব্দীতে যা কিছু নতুন তার সবটাই তখনকার পাশ্চাত্য ভাবনা ও ঘটনাবলির প্রভাব, আর যা কিছু পুরনো তা ঐ পূর্বের অনুরণন। সমাজ ও সংস্কৃতির এই সূত্র গ্রন্থিতেই বিংশ শতাব্দী উনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গে আবদ্ধ। তারাশঙ্করের জীবনে কাল ভাবনার এই আবদ্ধতা আছে, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ঊনিশ শতকের জীবন রসে পুষ্ট, অধিকাংশ সাহিত্যের পটভূমি জুড়েও রয়েছে ওই কালের ওই পরিচিত অঞ্চল—পরিবেশের পরিচিতি। তাই তাঁর জীবনের 'সেকাল" ঊনিশ শতকের বীরভুমের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। আর "একাল" এই সমকল বিশ শতকের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ। এই উভয়কালের কাঠামো তার সাহিত্যের পটভূমি। এখানকার পরিত্যক্ত মন্দির এই অঞ্চলের পুরনো সংস্কৃতিরই ঐতিহ্যবাহী, এইসব মন্দিরের উপর দিয়ে স্তরে স্তরে প্রবাহিত হয়েছে প্রাচীন সংস্কৃতির বিচিত্র তরঙ্গ। বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু ছাড়া আরো কত অজানিত সম্প্রদায় এই প্রাচীন পুণ্য প্রাঙ্গনে তাদের নিজেদের স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। যে তথ্য উদ্ধার করা আজ আর সম্ভব নয়, তবুও তারাপীঠ থেকে দক্ষিণে

অজয়ের তীরে কেন্দুলী পর্যন্ত যত্রতত্র এখনো রয়েছে অসংখ্য সাধকের বেদপীঠ। ধর্ম ও সংস্কৃতি জীবনের গভীরে রয়েছে তন্ত্র সাধনার কঠিন মন্ত্র বীজ। রাঢ়ের রাঙ্গামাটির পথের ধুলোয় মিশে আছে সহজিয়া বৈষ্ণব বাউলের পূর্ণ পদরেণু, ধর্মীয় জীবন জুড়ে রয়েছে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধর্ম ঠাকুরের প্রভাব। সামাজিক দায়-দায়িত্ব, এরা (অন্তজ সম্প্রদায়) হয়তো অধঃপতিত অথবা ইংরেজ সরকার ঘোষিত অপরাধ প্রবণ জাতি, অর্থনীতিতে কৃষি নির্ভর। তবুও সামাজিক ও অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও এই রাঢ় অঞ্চল উনিশ শতকে ও ছিল অনার্য লোকায়ত ব্রাত্য সাংস্কৃতিক লীলাভূমি। উন্নত সমাজও পারেনি তাদের বলিষ্ঠ আদর্শের প্রভাবে এদের প্রভাবিত করতে। অপেক্ষাকৃত নতুন কালে এসেছে পরিবর্তন বিশেষ করে জন্মভূমি লাভপুরে।

জন্মভূমি লাভপুর তারাশঙ্করের ভাষায় অদ্ভুত গ্রাম। ক্ষয়িষ্ণু জমিদার সম্প্রদায়ের সঙ্গে উঠতি বণিক দ্বন্দ্ব তখনো এখানে প্রতিদিনের। সমাজের নেতৃত্বের আসন নিয়ে, কীর্তি প্রকাশের প্রতিযোগিতা নিয়ে, পরস্পরের সঙ্গে চলেছে বিরোধ এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই লাভপুরের একের ওপর এক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্কুল, লাইব্রেরী, খেলার মাঠ, দেব মন্দির আর সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। সমাজে যারা সম্পন্ন ব্যক্তি তাঁরা করছেন প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্ব, আর যেসব মানুষের স্বল্প আয়, সামান্য কৃষি ক্ষেত্র ছিল যাঁদের আয়ের একমাত্র উৎস, তাঁরাই নতুন সভ্যতার অভিঘাতে অর্থনৈতিক পর্যায়ের সম্মুখীন হলেন। বিপর্যয়ের সর্বকালের সহচর ছিল দুঃখ। এই দুঃখই হল এঁদের জীবনের অবলম্বন। অশিক্ষিত অর্ধ—শিক্ষিতরাই হলেন এই দুঃখের শামীল। যাঁরা ইংরেজি জানতেন না, ধারণা ছিল বাইরের জগতে গিয়ে কিছুই করতে পারবেনা তাঁরা। অথচ এঁরাই ছিলেন লাভপুরের সামাজিক মর্যাদার যোগ্যতম পুরুষ, এইসব বিচিত্র অবস্থার বিপর্যয়ের অংশীদার অধিকাংশ মানুষই দেব বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাইলেন। এঁরা নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস করতে পারেননি। ভরসা করতে পারেননি রাজশক্তির উপর। একমাত্র পরিত্রাতা এবং ভরসাস্থল দেবতা। তাই অসহায় মানুষ ক্ষুদ্রতম দুঃখের জন্যও দেবতাকে মানত করেছেন। জীর্ণ বনস্পতির মতোই ভেঙ্গে পড়া এই সমাজের সর্বাঙ্গে সৃষ্টি হয়েছিল অসংখ্য কোঠর। সেখানেই বসে মানুষ মানত করেছে, পূজা করেছে, তান্ত্রিক মদ খেয়েছে, আর সাধক সাধনা করেছে নিবিষ্ট চিত্তে। চোর, ডাকাত, ঠ্যাঙারেরা গভীর রাত্রে মশাল জ্বেলে মজলিস জমিয়েছে দিনের আলোকে গণ্যমান্যদের সভা বসেছে। সম্পন্নদের চলেছে প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্ব।

সেকালের (উনিশ শতকের) এই জীর্ণ সমাজ সর্বস্তরের মানুষকে অকৃপণভাবে আশ্রয় দিয়েছে। এই সমাজের বুকে এসেছে ঝড়, নতুন কালের ঝড়ে জীর্ণতা বিলীন হয়েছে মহাকালের মধ্যে। কোঠরের, ফাটলের মানুষেরা পুরোনোর মধ্যেই আস্তানা খুঁজতে চেয়েছেন আর সম্পন্নেরা এগিয়ে এলেন নতুন কালের প্রত্যাশাপূর্ণ ভবিষ্যতের পথে।

এই নতুন কালের প্রারম্ভ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও তার প্রতিরোধ দিয়ে। পরবর্তীকালের বাংলার জাতীয় জীবনের চিত্র রাজনীতি মুখর। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদীদের নিপীড়ন এবং দেশীয় জমিদার, মহাজন, কাবুলিওয়ালা, নায়েব, গোমস্তাদের শোষণ ও পীড়ন ছিল উচ্চমাত্রায়। তবুও সামাজিক ও অর্থনৈতিক আরোহন ও অবরোহনের সঙ্গে বঙ্গাভঙ্গ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, অসহযোগ আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, আইন অমান্য আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ—প্রভৃতি ঘটনা ভারতীয় জাতীয় জীবনে এক বিচিত্র স্মরণীয় ঘটনা। এই বিচিত্রধারা বেয়ে লাভপুরের ভেঙে পড়া সমাজের সামনেও উপস্থিত হয়েছিল কালের নবরূপ। অরন্ধন, হরতাল, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, বিলাতি বস্ত্রে আগুন, মানিকতলায় বোমার মামলা, দিল্লির রাজসূয় যজ্ঞের শোভাযাত্রায় বোমা প্রভৃতি মহানগর কেন্দ্রিক ঘটনার জোয়ারে লাভপুরের জনজীবনে এসেছিল নতুন উদ্দীপনা। একেই অনুসরণ করে এসেছিল নতুন কালের সভ্যতার ফ্যাশন আর হুয়িস্কি। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল "বন্দেমাতরম" থিয়েটার দরিদ্র সেবা ভাণ্ডার আর নাট্য আন্দোলনকেই কেন্দ্র করে শুরু হয়েছিল সাহিত্যচর্চা।

বাংলা ১৩০৫ সালের ৮ই শ্রাবণ ইং ১৮৯৮ সালের ২৩শে জুলাই সূর্যোদয়ের ঠিক পূর্ব লগ্নে লাভপুরের মধ্যবিত্ত জমিদার পরিবারে তারাশঙ্করের জন্ম। শাস্ত্রমতে ৭ই শ্রাবণ। এ সম্পর্কে তারাশঙ্কর লিখেছেন, "আমাদের অঞ্চলে বলে ব্রাহ্ম মুহূর্তে সূর্য উদিত হয়নি তার লাল আভা ফুটেছে পূর্ব দিগন্তে, এমনই সময় আমার জন্ম বলে শাস্ত্রমতে আমার জন্মদিন ৭ই শ্রাবণ।" পিতা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা প্রভাবতী দেবী। লাভপুরের মৃত্তিকায় তখন দ্বন্দ্বের সমারোহ, সামন্ত তথা জমিদার তন্ত্রের সঙ্গো ব্যবসায়ীদের দ্বন্দ্ব। এমনই একটি সময়ে জমিদারির ভাঙ্গা বাজারে তারাশঙ্করের আবির্ভাব। দুই শ্রেণীর দ্বন্দ্ব তারাশঙ্কর তার জ্ঞান হওয়ার সময় থেকেই দুচোখ ভরে দেখেছেন। সে দ্বন্দ্বের ধাক্কা খেয়েছেন মধ্যবিত্তের খুদে জমিদার হিসেবে। তারাশঙ্করের বয়স যখন মাত্র আট বছর পিতা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তখন মারা যান, তারপর মা আর পিসিমার দেখাশোনায় বড় হয়েছেন তারাশঙ্কর। তাঁর হাতে খড়ি হয়েছিল বৈদ্যনাথধামে দেওঘরে।

তারাশঙ্করের মা প্রভাবতী দেবী পাটনার মেয়ে, তিনিও হালফিল কায়দায় ঘর সাজাতেন। লাভপুরের এই পরিবারের বিলীয়মান শ্রী ও সম্পদ নতুন করে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছিল। প্রভাবতী দেবী এই সংসারে আসার পরে। বাবা আর মায়ের সংযুক্ত ভালোবাসার পত্রখানি হাতে নিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন বালক তারাশঙ্করের সামনে। তারাশঙ্কর বলেছেন, "ধাত্রী দেবতার মায়ের সঙ্গো আমার মায়ের খানিকটা সাদৃশ্য আছে আমার আত্মীয়া একটি কলেজে পড়া মেয়ে ধাত্রী দেবতা পড়ে বলেছিল, "আপনি নিজের মাকে একেবারে মহিম ময়ী করে বই লিখেছেন"। "আমার মা সত্যিই মহিমময়ী', পিসিমা শৈলজা দেবী তারাশঙ্করের জীবনে আরেক মহৎ চরিত্র। প্রথম যৌবনে মাত্র ২২/২৩ বছর বয়সে একই দিনে স্বামীপুত্রকে কলেরায় হারিয়ে তিনি পিত্রালয় লাভপুরে এসেছিলেন। বুকে বয়ে এনেছিলেন চিতা বহ্নিমান। পিতৃহীন বালক তারাশঙ্কর মা ও পিসীমার স্নেহ ও শাসনে বেড়ে উঠেছেন। অভিভাবকহীন নাবালকদের জমিদারি ভূসম্পত্তি কিভাবে গ্রাস করা যায় তার ওই চেষ্টায় লাভপুরের উঠতি মহাজনেরা তখন সর্বদা ব্যস্ত। তারাশঙ্করের বাল্য ও কৈশোরের এমনকি যৌবনেরও অধিকাংশ সময় কেটেছে এমন ওই পরিবেশে লাভপুরে। সেই সময় তিনি সঠিকভাবে দেখেছেন মানুষকে, উপলব্ধি করেছেন মানুষের অন্তর্নিহিত লক্ষ্যটিকে। সবচেয়ে বড় কথাটি হলো—রাঢ় অঞ্চলের প্রকৃতি বিশেষ একটি চরিত্রের মতো তারাশঙ্করের জীবন ও সাহিত্যের সর্বত্রতার অদৃশ্য প্রভাব বিস্তার করে আছে। যার ফলে আবিষ্কৃত হতে পেরেছে রাঢ়ের রুক্ষ প্রকৃতি,—যার মাঝখানে রয়েছে সচল মানুষ।

লাভপুর অঞ্চলে লক্ষপতি ব্যবসায়ীদের সঙ্গো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারদের সংঘর্ষ বেধেছিল। জমিদার শ্রেণী যতই বিব্রত ও বিপন্ন হলেন ততই তারা ডাকতে শুরু করলেন ভগবানকে বহুরূপে ভগবান তখন হাজির। ৩৩ কোটি দেবতা। ধর্মজীবনের দুটি পথ শাক্ত আর বৈষ্ণব। দেবতারাও ছিলেন সৌভাগ্যের কাণ্ডারী। কাজেই মানতপ্রথা প্রচলিত ছিল। সকাল থেকে বাউল বৈষ্ণব আসতো ভিক্ষে করতে। শাক্ত সন্ন্যাসী, পদাবলী গায়ক, লাঠিয়াল, পীর মঙ্গাল, যাযাবর, গরু মারা, পটুয়া, সাপুড়ে, বেদেরাই তখন আসতো। তারা গান শোনাতে গল্প বলতো। তারাশঙ্কর ছোট থেকেই মন দিয়ে সে সব শুনতেন। সেই থেকে ঠাকুর দেবতার প্রতি তারাশঙ্করের বিশ্বাস জন্মেছিল। ছেলেবেলা থেকে তারাশঙ্কর প্রচুর গল্প শুনেছেন। তাঁর জীবনে প্রথম গল্প কথক হলেন মা প্রভাবতী দেবী, দ্বিতীয় পর্বের গোঁসাই বাবা রামজি সাধু, আর পরিণত বয়সে পেয়েছিলেন দুজনকে গৌর ঘোষ এবং ত্রিকাল ভট্টাচার্য তাঁদের নাম, ফুল্লরা মহাপীঠে তীর্থ ভ্রমণে এসে লাভপুরেই রয়ে যান গোঁসাই বাবা। একসময় তারাশঙ্করের বাবা হরিদাসের পরম বন্ধুতে পরিণত হয়। এই সন্ন্যাসীর জন্য হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় একটি আশ্রম তৈরি করে দেন এবং সন্ন্যাসীর ইচ্ছা অনুযায়ী একটি মন্দির তৈরি করে সেখানে শুক্লা চতুর্দশীতে তারা পূজোর প্রতিষ্ঠা করেন। যে বৎসর তারা পুজোর প্রবর্তন করেন সেই বছরেই ঠিক ১০ মাসে জন্ম হয় তারাশঙ্করের। সন্ন্যাসী নাম রাখেন তারাশঙ্কর। তারাশঙ্কর এ প্রসঙ্গো বলেছেন, "এই

সন্ন্যাসীটি আমার মমতায় এমনই আচ্ছন্ন হন যে, সমস্ত জীবনে তিনি আর লাভপুরে ত্যাগ করেননি। তাঁর পার্থিব দেহের সমাধি আমি নিজে হাতে রচনা করেছি। সন্ন্যাসী প্রথম জীবনে পল্টনে চাকরি করতেন, তখন তাঁর নাম ছিল বলভদ্র পাণ্ডে, সন্ন্যাসী জীবনে তাঁর নাম হয়েছিল রামজি সাধু” (আমার কালের কথা তারাশঙ্কর)। এছাড়া বীরভূমির রাঢ়ের মাটি থেকে উঠে আসা বহু ঘটনা ও কাহিনী ছিল তারাশঙ্করের কাছে সাহিত্যের উপাদান বা রসদ। সেরকম একটি ঘটনার উদাহরণ রয়েছে লাভপুরের “স্বর্ণ” বলে একটি শুকনো কাঠির মতো চেহারা মহিলা। একটু কুঁজো মাথায় কাঁচা পাকা চুল হাটে তরি তরকারি কিনে এসে গ্রামে বাড়ি বাড়ি ফিরে তা বেচে তার একার সংসার প্রতিপালন করত। বেচারী গ্রামের ভদ্র পল্লী থেকে দূরে বাস করত কারণ সমাজ তাকে ডাইনি অপবাদ দিয়ে একঘরে করেছিল। জেলে পাড়ার মোড়ে একটি ঘর বেঁধে সে বাস করত, চুপ করে ঘরের আধো অন্ধকারে সে বসে থাকতো, সারা পৃথিবীতে তার কোন আত্মীয় ছিল না। কারোর কিছু হলেই অযথা তার উপর চলতো অত্যাচার, মারধর। তার জীবন ছিল দুঃখ ভরা মর্মান্তিক বেদনার। কাউকে চোখে দেখে ভালো লাগলে সে চোখ বন্ধ করত। অনেক বয়স পর্যন্ত রোগের যন্ত্রণা এবং সামাজিক অত্যাচার সহ্য করে সে বেঁচেছিল। তার কথা লাভপুর অঞ্চলে অনেকেই জানে। তারাশঙ্করের মা প্রভাবতী দেবী ছিলেন প্রগতিপন্থী তিনি এইসব গ্রাম্য সুকংস্কার গ্রাহ্য করতেন না, বিশ্বাস করতেন না ডাইনি—ডাকিনির কথা। পিসীমা শৈলজা দেবী অবশ্য বালক তারাশঙ্করকে ভয় দেখাতেন ডাইনি নিয়ে। তারাশঙ্কর মায়ের শিক্ষা পেয়ে তাকে বলতেন “স্বর্ণ পিসি”। প্রভাবতী দেবী তাকে বলতেন, “ঠাকুরঝি”। ঐটুকুতেই সে কৃতার্থ। স্বর্ণ তাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে আসতো তারাশঙ্করের ক্রমে ভয় চলে গেল। তারাশঙ্কর পরিণত বয়সে স্বর্ণকে বুঝতে লাগলেন। স্বর্ণ নিজের দাওয়ায় বসে থাকতো আকাশের দিকে চেয়ে। আধো অন্ধকার ঘরের দুয়ারটিতে ঠেস দিয়ে বসে থাকত পৃথিবীর পরিত্যক্ত স্বর্ণ। মানুষকে ভালোবেসেই মানুষ সমৃদ্ধ; শিল্পী মানসে তার ওই প্রতিফলন—স্বর্ণ তাই ডাইনি নয় মানবী। তার একাকীত্বের মরুতেই এটুকুই বিশ্বাসের মরুদ্যান।

পরবর্তী জীবনে কখনো গ্রাম্য পরিব্রাজক তারাশঙ্কর পিঠে বোচকা বেঁধে এখানে সেখানে গ্রামে—গ্রামান্তরে মেলায় মেলায়—খেলায় ঘুরে বেড়াতেন তিনি সাহিত্যের রসদ সংগ্রহের জন্য। এই সময় গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরেছেন তিনি ধারাবাহিকভাবে। পাঁচুন্দির কাঁচা পথ ধরে কাটোয়ার রাস্তা দিয়ে গিয়েছেন উদ্ধারন দত্তের স্মৃতিবিজড়িত ভাগীরথীর ঘাট সংলগ্ন উদ্ধারন পুরে। দেখেছেন বৈষ্ণব, দেখেছেন শাক্ত, সর্বোপরি দেখেছেন মানুষ। বনওয়ারীবাদের রাজাদের কীর্তির ধ্বংসাবশেষ দেখেছেন, সঞ্চয় বেড়েছে অভিজ্ঞতার ঝুলিতে। সেইসব স্মৃতি তাঁকে সারা জীবন সফল শিল্পীর।

(ক্রমশ/চলবে)

প্রশ্নোত্তর

পরেশ চন্দ্র শেঠ

Some questions and answers regarding school administration

1. Is it abligatory on the Head master/Head mistress to place the school accounts in every meeting of the M.C.?

Ans. It is not obligatory, unless there is any specific and standing resolution in this matter.

2. Is the Managing Committee competent to interfere or intervence in the affairs of the staff council & academic council?

Ans. No. only when any matter is referred to the M.C. for a final decision in the case of a dispute or disagreement, the M.C. may take up the issue.

3. Is the Secretary Competent enough to ignore or setaside the views of the president of M.C. in regard to items for consideration on the agenda of the M.C?

Ans. As per sponsord rule 18, the Secretary of M.C. shall fixup the agenda in consultation with the President. If the Secretary ignores or sets aside the advice of the President, he may draw the attention to the M.C. and put up his grievance before the meeting.

4. What is meant by Adjourned meeting of Managing Committee?

Ans. When the meeting of the M.C. starts after proper quorum the President of the committee in its meeting may declare the meeting adjourned (i.e. not to proceed further with any of the agenda for discussion). Such meeting may be held later on with the same agenda on a short notice. But no fresh agendum will be included for discussion.

5. What is meant by 'deferred agenda'?

Ans. It means that any of the items of discussion on the agenda may be left out for discussion on consideration, if it is considered essential and unanimousely decided. How ever, a point of order may be raised by any of the members and the matter may be put to vote for decission. No quorum is necessary for the deferred meeting.

6. What is meant by 'Postponed' meeting?

Ans. For want of quorum as per rule, the meeting of the M.C. cannot be held. But in the Minute Book it should be recorded to the effect the "The ordinary meeting/ emergency meeting of the M.C. to be held on......could not be held for want of quorum." This decision should be backed by the signatures of all the numbers present.

7. Can any fresh item be put up for discussion in the miscellaneous agenda?

Ans. Yes, but no such item of discussion involving appointment or dismissal or removal of any staff can be taken up without previous notice as per rules.

8. Is there any scope of giving note of dissent or any agenda?

Ans. Yes, If the concern Authority refuse to record it, the member may refer to the D. I. of schools for his grievance.

9. Can the president give any ruling in the meeting of the Managing Committee?

Ans. No such power of provided in the management rule.

10. Is there any provision of a Meeting by circulation?

Ans. There is no such provision in the Management rule. But it is one of the democratic convention, In exceptional circumstances, any such single resolution adopted unanimously and signed by all the members and subsequently confirmed in the next general meeting is acceptable to the authorities.

11. What is meant by Emergency meeting of the Managing Committee?

Ans. An emergency meeting may be convened by the president of the committee on 24 hours notice on such matter of emergency nature only. Hence, there should be a single agenda, subject to confirmation or revision at the nextg ordinary meeting.

12. Is the Managing Committee of a High/Higher Secondary schools statutory body?

Ans. The Managing Committee of a High/Higher Secondary school is a statutory provision made and defined in clause (d) section 2 of W.B.B.S.E. Act of 1963 and in the subsequent amendments :

Hon'ble Justice Mr. P. K. Banerjee observed that the Managing Committee of a High/ Higher secondary school is not a statutory Body and as such, the writ does not lie against the Managing Committee.

13. What is statute?

Ans. Statute is a written law of Legislative Body. The West Bengal Board of Secondary Education Act of 1963 was passed in the W.B. Legislative Assembly under W.B. Act of 1963 and subsequently amended from time to time, so the W.B.B.S.E is a statutory Body.

14. Who is the custodian of the school property?

Ans. In case of Govt. sponsord Institution Head of the Institution in the Secretary of the M.C. by virtue of his/her post he/she is the custodian of the school properly.

15. Whether the school authority is competent enough to sale or transfer the landed property of the school without any prior permission of the W.B.B.S.E.?

Ans. The school authority is not the competent enough to sale/purchase/transfer the landed properly of the school without the prior permission of the Board.

16. Whether the Headmaster of high school is legally to inform the local police of all cases of missing of the things in the school premises with in the school hours?

Ans. The Head of the Institution in free and competent to take appropriate action to prevent stealing inside the school premises.

17. Whether the Head master has authority to investigate in to the matter to find out the guilty be himself/herself or by the help of his/her staff?

Ans. He or she is competent to enquire into the matter himself/herself or with the person of his/her choice. The thift of articles are to be reported to the police authority.

18. Whether the school authority is competent enough to sale or transfer the landed properly of the school without any prior permission of the W.B.B.S.E?

Ans. The school authority is not competent enough to sale/purchase/transfer the landed property of the school without the prior permission of the board. The decision in this matter taken in the executive committee of the Board is final.

19. Who is the competant authority to write down the decision of the M.C. as recorded on the resolution book?

Ans. Any competent person authorised by the M.C. may write down or record resolutions take in the meeting in presence of all members present in the M.C. meeting.

20. It is pointed to the query page of resolution of the minute book on the upper part that "The name of members present" only. But question is that after the decision of the M.C. recorded on the minute book is further necessary to signature of the present members the lower part of the said resolution for avoid the futher litigation?

Ans. If there is consensus of opinion among the members to make signature of the lower part of the resolution, there will be no bar to management rules rather it will help to avoid future litigation.

21. If a teaching or non-teaching staff is obliged to remain present in a guardian's meeting or in an observation programme beyond the normal school hour if asked by the school authority?

Ans. As per rules of conduct the discipline of the teaching and non-teaching staff of the school 2004 all the staff are obliged to remain present in observance programme of the school and a guardian meeting, if considered necessary.

22. If the Head master of a school is competent to send up a candidate unsuccessful as per the boards rule in the Test Examination for M.P. at his discreation?

Ans. Without prior approval of the M.C. in respect of publication or result, the Head master has no discretionary power to declare result of any student.

23. If there is any scope of the M.C. to hold a meeting with all teaching and non-teaching staff of the school if considered necessary?

Ans. There is an ample scope of the M.C. to hold meeting with all teaching and non-teaching staff of the school where and when the interest of both students, teachers and society are associated.

24. Whether the school authority is entitled to ask the regular teachers to take classes of the sent-up candidates for M.P. until end of the said board's examination as usual school hour?

Ans. The school authority if so desires may make all arrangement for taking classes for sent-up coandidates for better result of the students of the school by regular revision of the courses of different subjects provided class routine/academic calender is prepare according by the Academic council.

25. Please let me know in case of married girl student of Secondary school, whether her husband is entitled to legal guardian voter?

Ans. Any relation other than Father/mother etc. as prescribed in rule 2 (Note-a) of the Management Ruels with whom the ward is actually residing shall be the guardian provided the name of husband of the married girl does not occur in the Admission Register.